www.banglabook.com

# প্রিয়তমাসু

হুমায়ূন আহমেদ

sohell.kazi@gmail.com

www.banglabook.com

www.banglabook.com

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

নিশাত কি-হোলে চোখ রাখল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ দরজায় ধাক্কা পড়ছে। নিশাত বলল, কে? কোন উত্তর নেই। চাপা হাসির মতো শব্দ। নিশাত দরজা খুলল। আশ্চর্য কাণ্ড! এইটুকু একটা বাচ্চা। সবে দাঁড়াতে শিখেছে। তাও নিজে নিজে নয়। কিছু-একটা ধরে দাঁড়াতে হয়। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে কেমন দুলছে।

: খোকন, তোমার কী নাম?

খোকন বিশাল একটা হাসি দিল। নিচের মাটির একটি মাত্র দাঁত। সেই দাঁত হাসির আভায় ঝিকঝিক করছে। নিশাত উঁচু গলায় জহিরকে ডাকল, এই, কাণ্ড দেখে যাও।

: কী কাণ্ড?

: না দেখলে বুঝবে না। বিরাট এক অতিথি এসেছে।

জহির গলায় টাই বাঁধছিল। আয়নার সামনে থেকে নড়া উচিত নয় তবু নড়ল। নিষ্প্রাণ গলায় বলল, এ কে?

: পাশের বাসার। কীরকম অসাবধান মা দেখেছ! বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়েছে। যদি সিঁড়ির দিকে যেত!

জহির আয়নার সামনে চলে গেল। টাইয়ের নটে গোলামাল হয়ে গেছে। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। সে নট ঠিক করতে করতে বলল, নিশাত, বাচ্চাটাকে ঘরে ঢুকিও না।

: ঢোকাব না কেন?

: বাচ্চাদের একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে, সাজানো-গোছানো ঘর দেখলেই এরা প্রাকৃতিক কর্মটি করে ফেলে। ও এক্ষুণি তা করে ফেলবে।

: ফেলুক। এই খোকন ভেতরে আসবে? টু টু টু টু।

: নতুন কেনা কার্পেট, খেয়াল রেখো।

নিশাত বলল, মা-টা কেমন দেখলে? একদম ন্যাংটো বাবা করে রেখে দিয়েছে। একটা প্যান্ট পরাবে না!

আয়নায় নিশাতের ছায়া পড়েছে। জহির অবাক হয়ে দেখল নিশাত বাচ্চাটার পেটে নাক ঘষছে। জহির হালকা গলায় বলল, আদরটা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে না?

: আদর কখনো বাড়াবাড়ি হয় না। বাড়াবাড়ি হয় ভালোবাসায়।

: যার বাচ্চা তাকে দিয়ে এসো। দ্যাখো কেমন গা মোচড়াচ্ছে। এটা হচ্ছে বড় কিছু করবার প্রস্তুতি।

; আচ্ছা, এর হাতে একটা ক্র্যাকার দেব? গলায় বেঁধে যাবে না তো আবার?

: ক্র্যাকার-ফ্যাকার দিও না। লোভে পড়ে যাবে। রোজ আসবে।

: আহা আসুক না! এই খোকন ক্র্যাকার খাবে? টুটু টুটু।

খোকন জবাব দেবার আগেই খোকনের মা'র ভয়কাতর মুখ দেখা গেল। নিশাত লক্ষ্য করল বেচারি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে



sohell.kazi@gmail.com

আছে। নিশাত সহজভাবে বলল, এত ছোট বাচ্চাকে একা ছাড়তে আছে? যদি সিঁড়ির দিকে যেত?

: ও ঘুমাচ্ছিল। কখন যে জেগেছে বুঝতেও পারিনি।

: বাচ্চার কী নাম?

: ওর নাম পল্টু।

: পল্টু আবার কীরকম নাম? বড় হলে ওর বন্ধুরা ওকে বল্টু বলে খ্যাপাবে। ওর একটা ভালো নাম রাখুন।

মেয়েটি হেসে ফেলল। নিশাত বলল, আসুন না, ভেতরে আসুন। মেয়েটি লাজুক দৃষ্টিতে জহিরের দিকে তাকাচ্ছে। নিশাত বলল, ও এক্ষুণি অফিসে চলে যাবে। আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হোক। আমরা পাশাপাশি থাকি অথচ আলাপ নেই।

: ঘর খোলা রেখে এসেছি। তালা দিয়ে আসি?

বলেই মেয়েটি উত্তরের অপেক্ষা করল না। ছুটে চলে গেল।

জহির হ্যান্ডব্যাগে অফিসের ফাইল ভরতে ভরতে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, মহিলা বেশ অসাবধান। ব্লাউজের বোতাম খোলা ছিল তুমি লক্ষ্য করেছ?

: এত কিছু থাকতে তোমার চোখ গিয়ে পড়ল ঐখানে? আয়নার ভেতর দিয়ে এতসব দেখে ফেললে?

: তোমার কি ধারণা আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি?

নিশাত জবাব দিল না। তার একটু মন-খারাপ হয়েছে। জহির ব্লাউজের প্রসঙ্গে না তুললেও পারত। শালীনতার একটা ব্যাপার আছে। জহিরের কি তা মনে থাকে না?

: রাগ করলে নাকি নিশাত?

: না। এত চট করে রাগ করলে চলে না। আজও কি তোমার ফিরতে দেরি হবে, না সকল-সকাল-ফিরবে?

: রাত আটটার মধ্যে ফিরব। পজেটিভ।

পল্টু সাহেব তার কাজটি এখন সারছেন। কার্পেটের ওপর তীব্র বেগে ঝরনার ধারা পড়ছে। পল্টুর মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। নিশা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকাল জহিরের দিকে। জহির কিছু বলল না। ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল। তার আজকের বিদায় অন্য দিনের মতো হল না। অন্য দিন নিশাত তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দু'একটা টুকটাক কথা হয়। আশপাশে কেউ না থাকলে জহির অতি দ্রুত তার ঠোঁট এগিয়ে আনে। সেই সুযোগ সে খুব বেশি পায় না।

পল্টুর মা ফিরে এসেছে। এর মধ্যেই সে বেশভূষার কিছু পরিবর্তন করেছে। প্রথম যে জিনিসটা নিশাতের চোখে পড়ল তা হচ্ছে ব্লাউজের বোতাম লাগানো। চুল খোঁপা করা। পরনে অন্য একটা শাড়ি।

: আপা আসব?

: আসুন আসুন।

: উনি অফিসে চলে গেছেন, তা-ই না?

: হ্যাঁ।

: আপনি তো আজ ওনাকে এগিয়ে দিলেন না? রোজ দেন।

নিশাত একটু যেন হকচকিয়ে গেল। অবিশ্যি তার বিস্ময়ের ভাব তেমন প্রকাশ পেল না। এই মেয়েটি যদি অফিসে এগিয়ে দেবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তাহলে আরও কিছু



হয়তো লক্ষ্য করেছে। নিশাত সহজ গলায় বলল, আপনি চা খাবেন? চা করি আপনার জন্যে?

: জি আচ্ছা। আর আপা আমাকে আপনি-আপনি করে বলবেন না। আমার বয়স কিন্তু খুব কম।

: তা-ই নাকি?

: জি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাঝখানে আমার বিয়ে হল। অংক পরীক্ষা দিয়ে বাসায় এসে শুনি আমার বিয়ে। কয়েকজন লোক ডেকে এনে বিয়ে। সেই রাতেই শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম।

: বাকি পরীক্ষাগুলো নিশ্চয়ই দাওনি?

: জি না। আমার শ্বশুর সাহেব বললেন, মেয়েদের আসল পরীক্ষা হল সংসার। ঐ পরীক্ষায় পাস করতে পারলে সব পাস।

: ঐ পরীক্ষায় কি পাস করেছ?

সে হেসে ফেলল। নিশাত বলল, তুমি বসো এখানে। বাচ্চার সঙ্গে খেলা করো, আমি চা বানিয়ে আনছি। খোকনের হাতে কি আমি একটা ক্র্যাকার দেব?

: দিন-না! যা দেবেন ও তা-ই খাবে।

: গলায় আটকাবে না তো আবার?

: উঁহু। আটকাবে কেন? একদিন ও তার বাবার একটা সিগারেট গিলে ফেলেছিল। প্যাকেট বের করে টপ করে মুখে দিয়ে ফেলল। তারপর সেকী বমি!

নিশাত চায়ের পানি চড়িয়েছে। সকালের কিছু কাজকর্ম তার এখনও বাকি। নাশতার প্লেট পরিষ্কার করা হয়নি। লন্ড্রির ছেলেটা আসবে কাপড় নিতে। টেলিফোন অফিসে যেতে হবে। সাতশো টাকা বিল এসেছে। অথচ টেলিফোন বলতে গেলে করা হয়নি। কমপ্লেইন করতে হবে। কলাবাগানে মা'র কাছে যাওয়া দরকার। গত সপ্তাহে যাওয়া হয়নি। মা নিশ্চয়ই রেগে আছেন।

: আপা আসব?

রান্নাঘরের দরজা ধরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

: এসো।

: বাবু ঘুমাচ্ছে।

: বিছানায় শুইয়ে দাও।

: বিছানা লাগবে না। ও আরাম করে কার্পেটে ঘুমাচ্ছে। আপা, আপনার রান্নাঘরটা কী সুন্দর!

তোমার পছন্দ হচ্ছে?

: খুব পছন্দ হচ্ছে। খুব সুন্দর! ছবির মতন!

: তোমার রান্নাঘরও তুমি এরকম করে সাজিয়ে নাও। রান্নাঘর তো একই রকম।

:আপনি কি ভেবেছেন আমরা পাশের ফ্লাটটায় ভাড়া থাকি? মোটেই না। ও বেতনই পায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। তাও বাড়িভাড়ার মেডিকেল সব মিলিয়ে। এর মধ্যে দুশো টাকা কেটে নেয়। আর ফ্লাটের ভাড়াই পাঁচ হাজার। ওর এক দূর সম্পর্কের চাচা ফ্লাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন। তিন মাসের অ্যাডভান্স দিলেন। উঠলেন না। ইরান না ইরাক কোথায় নাকি যাচ্ছেন। বাড়িওয়ালা অ্যাডভান্সের টাকাও ফেরত দেবে না। চাচা বললেন, ঠিক আছে তোরা থাক এই ক'দিন।

: ভালোই তো হল। তিন মাস থাকা গেল।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: দুই মাস তো আপা চলেই গেল। ওর যা কষ্ট! অফিসের পর রোজ বাসা খুঁজতে যায়। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টার মতো বাজে। একদিন ফিরল রাত এগারোটা। বাসাবো না কোথায় নাকি গিয়েছিল।

: নাও চা নাও। চিনি হয়েছে কি না দ্যাখো তো! চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু খাবে? টোস্টে জেলি মাখিয়ে দিই?

: দিন।

নিশাত টোস্টের টিন বের করল। ফ্রিজ খুলে জেলির কৌটা বের করল। একটা পিরিচে পটেটো চিপস ঢাললো।

: আপা আমি যে হুট করে রান্নাঘরে চলে এসেছি আপনি কি রাগ করেছেন?

: রাগ করব কেন? তুমি আসায় বেশ সুন্দর গল্প করতে পারছি। যখন ইচ্ছা হয় আসবে। আমি একাই থাকি।

: আপা আমার নাম পুষ্প।

: বাহ্ খুব সুন্দর— পুষ্প বনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে। কে লিখেছে জানো?

: জি না।

: বইটাই তেমন পড় না বোধহয়।

: আগে পড়তাম, এখন সময়ই পাই না। কোনো কাজের লোক নেই। সব কিছু নিজে করতে হয়।

: কাজের লোক আমারও নেই। অবিশ্যি আমরা দুজন মাত্র মানুষ। আমাদের দরকারও হয় না।

: একটা বাচ্চা হোক তখন দেখবেন কত কাজ! নিশ্বাস ফেলার সময় পাবেন না। আপা আমি এখন যাই?

: আচ্ছা, আবার এসো। পল্টু সাহেবকে এখন আর ঘুম ভাঙ্গিয়ে নেবার দরকার নেই। কাঁদবে হয়তো। জেগে উঠলে আমিই দিয়ে আসব।

পুষ্প চলে গেল। পল্টু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। এক হাতে একটা ক্র্যাকার। তা এখনও হাতে ধরা আছে। নিশাত খুব সাবধানে পল্টুকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। এ তার মায়ের রূপ পেয়েছে।

নিশাতের মনে হল সে ছোট্ট একটা ভুল করেছে। পুষ্পকে বলা দরকার ছিল—পুষ্প, তুমি খুবই সুন্দরী একটি মেয়ে। মেয়েটা খুশি হত। মেয়েটিকে দেখেই মনে হয় এ অল্পতে খুশি-হওয়া মেয়ে। এই ধরনের মেয়েরাই প্রকৃত সুখী হয়।

স্বামী হয়তো শোবার আগে মিষ্টি করে একটা কথা বলবে এতেই আনন্দে এ-মেয়ের চোখ ভিজে উঠবে। সমস্ত দিনের গ্লানি ও বঞ্চনার কথা মনে থাকবে না। শুধু মনে হবে তারচেয়ে সুখী এ-পৃথিবীতে কেউ নেই।

বাচ্চা ছেলেটা ঘুমের মধ্যেই হাসছে। কী অপূর্ব দৃশ্য! ঠোঁটের কোণে বিসকিটের গুঁড়ো লেগে আছে। যেন কেউ চন্দন মাখিয়ে দিয়েছে। আর হাসছে কী মিষ্টি করে। অপূর্ব কোন স্বপ্ন দেখছে হয়তো। শিশুদের স্বপ্ন কেমন হয় কে জানে?

এই সুন্দর হাসির একটা স্কেচ করে রাখলে কেমন হয়? পেনসিল আছে না ফুরিয়ে গেছে নিশাত মনে করতে পারছে না। আজকাল ছবি আঁকাই হয় না। কোন জিনিসটি আছে কোনটি নেই কে জানে! বেশ কিছু চারকোল ব্লক একবার ব্যাংকক থেকে নিয়ে এসেছিল। ইচ্ছা ছিল প্রচুর চারকোল ড্রইং করবে। একটিও করা হয়নি। ছবি আঁকার ইচ্ছা হয়েছে আঁকা হয়নি। কোন ইচ্ছাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এটাও হবে না। কাগজ এবং

পেনসিল নিয়ে বসবার পর হয়তো আর আঁকতে ইচ্ছা করবে না। অদ্ভুত এক ধরনের আলস্য বোধ হবে। বাচ্চা ছেলেটি এখনও ঠোঁট বাঁকিয়ে আছে। কী বিশ্রী একটা নাম! এই যুগের ছেলেদের কত সুন্দর সুন্দর নাম রাখা হচ্ছে—অয়ন, মৌলি, নাবিল, তা না—পল্টু। ছি, পুষ্পকে বলতে হবে নামটা বদলে দিতে। দরকার হলে সে নিজে সুন্দর একটা নাম খুঁজে দেবে। টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। বাচ্চাটার আবার ঘুম না ভেঙ্গে যায়, নিশাত ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল। কলাবাগান থেকে মা টেলিফোন করেছেন।

: নিশাত কথা বলছিস?

: হ্যাঁ মা।

: তুই আজ সন্ধ্যায় আসতে পারবি?

: আমি তো ভাবছিলাম এখুনি আসব।

: চলে আয়। গাড়ি পাঠাতে পারব না। তোর বাবা নিয়ে গেছেন।

: গাড়ি লাগবে না।

: তোর গলাটা এমন ভারি ভারি শোনাচ্ছে কেন?

: জানি না মা।

: তোর কি কোনো ব্যাপারে মন খারাপ?

: হুঁ।

: কী হয়েছে? জহিরের সঙ্গে ঝগড়া?

: না, ওর সঙ্গে আমার কখনো ঝগড়া হয় না। তোমাকে বলেছিলাম না বিয়ের সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কখনো ঝগড়া করব না। স্ট্যাম্পের ওপর সই করে প্রতিজ্ঞা।

: তাহলে মন খারাপ কেন?

: তা তো মা জানি না। মাঝে মাঝে আমার এরকম হয়। সন্ধ্যাবেলা আসতে বলছ কেন? কী ব্যাপার?

: তোর বাবার কাণ্ড। বিরাট একটা পাঙাশ মাছ কিনে এনেছে। খুব নাকি ফ্রেশ মাছ। সবাইকে নিয়ে খাবে।

: বাবা এমন খাইখাই করে কেন বলো তো মা?

: জানি না। একেকবার এমন বিরক্ত লাগে! কিছুক্ষণ আগে ঐ মাছের ছবি তোলা হল।

: মা শোনো—কয়েকটা সুন্দর দেখে ছেলের নাম দিও তো!

: কেন রে?

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের দেবশিশুর মতো একটা ছেলে, নাম রেখেছে পল্টু। নামটা পালটাব।

: তুই এখনও পাগলি হয়েই রইলি।

নিশাতের মা খুব হাসতে লাগলেন। নিশাতও হাসছে। বাচ্চাটির ঘুম ভেঙে গেছে। প্রথমে সে কাঁদবার উপক্রম করেছিল। এখন মত পালটে হাসিতে যোগ দিয়েছে। খুব হাসছে।

## ২

রাত আটটা বাজতেই পুষ্পের ঘুম পেয়ে যায়। ন'টার দিকে সেই ঘুম এমন হয় যে সে চোখ মেলে রাখতে পারে না। ঘুম কাটানোর কত চেষ্টা সে করে! কোনটাই তার বেলা কাজ করে না। অথচ রকিব রোজ ফিরতে দেরি করে। আজও করছে।

sohell.kazi@gmail.com

এখন বাজছে ন'টা তেত্রিশ। আজ বোধহয় দশটাই বাজবে। পুষ্প চোখে পানি দিয়ে এল। জিরে লবণ ছেঁয়াল। জিরে লবণ ছোঁয়ালে নাকি ঘুম কাটে। তার কাটছে না। আরও যেন বাড়ছে।

রকিব ফিরল দশটায়। বিরক্তমুখে বলল—কী যে তোমার ঘুম, আধঘণ্টা ধরে বেল টিপছি! তাড়াতাড়ি গোসলের পানি দাও।

পুষ্প ঘুমঘুম চোখে রান্নাঘরে ছুটে গেল। প্রচণ্ড গরমেও রকিবের গোসলের পানিতে এক কেতলি ফুটন্ত পানি ঢালতে হয়। একটু ঠাণ্ডা পানি গায়ে ঢেলেছে কি লাগেনি লোকটির ঠাণ্ডা লেগে যায়। খুকখুক কাশি, গলাব্যথা। কী অদ্ভুত মানুষ!

রকিব বাথরুমে ঢুকে পড়ল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করল না। রকিবের স্বভাব হচ্ছে গোসল করতে করতে খানিকক্ষণ কথা বলা। বাথরুমের দরজা খোলা এই কারণেই। পুষ্পের এটা ভালো লাগে না। বলেছেও কয়েকবার। রকিব কান দেয়নি।

: পুষ্প, বাড়ি একটা পাওয়া গেছে।

: তাই-না কি?

: দুটো রুম। নেটদেয়া বারান্দা। গ্যাস-ইলেকট্রিসিটি দুইই আছে।

: ভাড়া কত?

: কম। খুবই কম।

: কত?

: আন্দাজ করো তো দেখি?

: পনেরোশো?

রকিব মনের আনন্দে খানিকক্ষণ হাসল। যেন সে খুব মজা পাচ্ছে।

: বলো-না কত?

: বারো। ওনলি টুয়েলভ হানড্রেড।

: সত্যি?

: হুঁ। একটা সমস্যা আছে। সাময়িক সমস্যা। ফর দা টাইম বিইং একটু অসুবিধা হবে। ধরো তিন-চার মাস। তার পরই সমস্যার সমাধান।

: সমস্যাটা কী?

: পানির কানেকশন দেয়নি। মাস তিনেক লাগবে। ওয়াসার ব্যাপার।

পুষ্প অবাক হয়ে বলল, পানি ছাড়া চলবে কীভাবে?

: সব ঠিক করে রেখেছি। একটা ড্রাম কিনে ফেলব। লোক রাখব। ঠিকা লোক। তার কাজই হবে সকালবেলা ড্রাম ভর্তি করে দেয়া। এক ড্রামের বেশি পানি তো আমাদের লাগবে না।

পুষ্প ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। একবার ভাবল বলবে—পানি ছাড়া বাড়িতে যাব না। বলল না, কারণ, বললেই চ্যাঁচামেচি শুরু করবে। রাতে হয়তো ভাতও খাবে না। ধীরেসুস্থে বললেই হবে। পুষ্প খাবার বাড়তে শুরু করল। খাবারের আয়োজন খুবই খারাপ। ডাল চচ্চড়ি আর আলুভর্তা।

পুষ্প বলল, আস্তে আস্তে খাও। আমি চট করে একটা ডিম ভেজে আনি।

: ডিম লাগবে না। এতেই হবে।

: না, হবে না।

: তাহলে ঐ সঙ্গে দুটো শুকনা মরিচ ভেজে আনবে।

রকিবের চোখ উজ্জ্বল। বাড়ির সমস্যা মিটে গেছে এই আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে।



সে ভাত মাখতে মাখতে বলল, পানির এত দরকারও আমাদের নেই। মরুভূমিতে লোকজন কী করে? এক গ্লাস পানি হলে তাদের তিনদিন চলে যায়।

: আমরা তো আর মরুভূমিতে থাকি না।

: তা না থাকলাম। তাই বলে অপচয় করব?

পুষ্প একসময় বলল, তোমার বন্ধু মিজান সাহেবকে বলো না, উনি যে একবার বলেছিলেন বাড়ি দেখে দেবেন।

: ওর কথা বাদ দাও। একশো ধান্ধায় থাকে। ঝোঁকের মাথায় বলেছিল, এখন হয়তো মনেও নেই।

: তবু একবার বলে দ্যাখো।

: আচ্ছা বলব। বাসায় চা খেতে একদিন ডাকব। তখন মনে করিয়ে দিলেই হবে।

: লাভ হবে না। ঢাকা শহরে দুই হাজারের নিচে বাড়ি নেই। এটা হয়ে গেছে বড়লোকের শহর।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া রকিবের স্বভাব। মশারির ভেতর থেকে আধখান শরীর বের করে আয়েশ করে সিগারেট খায়। সিগারেটের শেষ অংশ হাতে থাকতেই তার ঘুম এসে যায়। আজ ব্যতিক্রম হচ্ছে। রকিব খাতা-কলম নিয়ে বসেছে। পুষ্প বলল, চিঠি লিখছ?

: উঁহু, একটা হিসাব। জটিল হিসাব।

: কিসের হিসাব?

: বারোশো টাকা যদি বাড়ি ভাড়া হয় তাহলে সেভিংসে কিছু থাকে কি না। আমার খরচটা ধরি। বাসভাড়া, হাতখরচ, পান-সিগ্রেট ধরো দুইশো।

: দুইশোতে হবে না, তিনশো।

: আচ্ছা ধরো তিনশো। চাল আমাদের কতটুকু লাগে? আধমণ লাগে? আধমণ তো লাগার কথা না। ধরো আধমণই। আধমণের দাম কত? সরসটা ধরবে না প্লেইন ইরি, কত করে মণ?

: সাড়ে চারশো টাকা মণ। আধমণ হচ্ছে দুইশো পঁচিশ।

: ধরলাম দুইশো পঁচিশ।

পুষ্প বলল, এসো শুয়ে পড়ি। সকালে হিসাব-নিকাশ করবে। ঘুম পাচ্ছে। বাবু দুপুরে ঘুমুতে দেয়নি।

: কতক্ষণ আর লাগবে! খুব টাইট বাজেটের ভেতর দিয়ে চললে আমার মনে হয় কিছু সেভ করা যাবে।

পুষ্প মশারির ভেতর ঢুকে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার, শোয়ামাত্র তার ঘুম কেটে গেল! মনে হতে লাগল তার মতো সুখী মেয়ে এই পৃথিবীতে নেই। ছোট্ট সংসার। ভালোমানুষ ধরনের স্বামী। শাশুড়ি-ননদের কোনো ঝামেলা নেই। এর চেয়ে বেশি সুখী একটি মেয়ে কী করে হয় তার জানা নেই।

: পুষ্প!

: বলো।

: প্রতি মাসে একটা দুটা প্রাইজবন্ড কিনে রাখব বুঝলে। লেলে গেলে কেল্লাফতে। আমাদের অফিসের একজন দশ হাজার টাকা পেয়ে গেল। হাজার পাঁচেক টাকা সব সময় হাতে থাকা দরকার। কখন কী ঝামেলা হয় কিছুই বলা যায় না।

পুষ্প চুপ করে রইল। একবার ভাবছিল বলবে—আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে। আমার নানি দিয়েছেন। বলল না। নানিজান হজে যাবার সময় তাদের তিন বোনের



www.banglabook.com

www.banglabook.com

প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে টাকা দিয়ে গিয়েছেলেন। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির সুরোহাও বিলিব্যবস্থা করে গেলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল হজ করে তিনি ফিরবেন না। ইশতেফাকা করে নাকি এই খবর জেনেছেন। হজ করে তিনি পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এখন একেক ছেলের সংসারে কিছুদিন করে থাকেন আর তাদের বিরক্ত করে মারেন। কারও সঙ্গেই তাঁর বনে না। পুষ্পের খুব ইচ্ছা নানিজানকে এ-বাড়িতে এনে কিছুদিন রাখে। সাহসে কুলায় না। কে জানে এসেই যদি নাতজামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেন। তাহলে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে।

রকিব মশারির ভেতর এসে ঢুকল। পুষ্প বলল, বাতি নেভালে না? বাতি নিভিয়ে আসো।

: একটু পরে নেভাব।

পুষ্পের লজ্জা করতে লাগল। রকিবের বাতি না নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢোকার অন্য অর্থ আছে। পুষ্প খুব সাবধানে তার ছেলের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল। সে যদি জেগে ওঠে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। পুষ্প ক্ষীণস্বরে বলল—আমি বাতি নিভিয়ে দিয়ে আসি?

: উঁহু। অন্ধকারে আমার ভালো লাগে না।

: বাবু উঠে যাবে।

: উঠবে না।

রকিব পুষ্পকে কাছে টেনে নিল। তার মুখে সিগারেটের কড়া গন্ধ। অন্য সময় এই গন্ধে পুষ্পের বমি আসে। এখন আসছে না। বরং ভালো লাগছে। রকিব কানের কাছে মুখ নিয়ে গাঢ় আদরের কিছু কথা বলছে। এই সময়ের আদরের কথার আসলে তেমন গুরুত্ব নেই তবু পুষ্পর শুনতে ভালো লাগে। তারও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে বলতে পারে না। লজ্জা লাগে। তবে অর্থহীন কিছু কথাবার্তা এই সময়ে সে বলে। রকিব মন দিয়ে শোনে কি না সে জানে না তবে প্রতিটি কথারই উত্তর দেয়।

: পাশের ফ্লাটের ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা হল।

: তা-ই নাকি?

: হ্যাঁ, অনেক কথা বললেন। চা খাওয়ালেন। বাবুকে খুব আদর করলেন। বিসকিট দিলেন।

: ভালোই তো।

: ওনাকে দেখতে অহংকারী মনে হয় কিন্তু আসলে অহংকারী না। বাবুর পল্টু নামটা ওনার পছন্দ হয়নি।

: তাদের ছেলেপুলেদের নাম কী?

: ছেলেমেয়ে নাই। যখন হবে খুব সুন্দর নাম নিশ্চয়ই রাখবেন।

: রাখুক যা ইচ্ছা। আমাদের পল্টুই ভালো। মেয়ে হলে মেয়ের নাম রাখব খুন্তি।

: কী নাম রাখবে?

: খুন্তি।

: কী যে তুমি বল! এই দ্যাখো না বাবু মনে হয়ে উঠে যাচ্ছে। কেমন পা নাড়াচ্ছে দ্যাখো-না।

: ও ঘুমাচ্ছে মড়ার মতো। ঘণ্টা দু'একের মধ্যে উঠবে না।

: না না, বুঝতে পারছ না, ওর ঘুম ভাঙার সময় হয়ে গেছে।

: উঁহু হয়নি।

: বাতিটা নেভাও, তোমার পায়ে পড়ি।



: নেভাব না।

বাবু ঠিক এই সময় জেগে উঠল। বিকট স্বরে কেঁদে উঠল। পুষ্প থমথমে গলায় বলল, এখন শিক্ষা হল তো?

রকিব হাসছে। মনে হচ্ছে তার শিক্ষা এখনও হয়নি।

৩

এ-বাড়ির কলিংবেলটা কী সুন্দর করেই-না বাজে! যেন একটা পুরনো দেয়ালঘড়ি ঢং ঢং করে বাজছে। প্রথম দু'তিনবার খুব গম্ভীর আওয়াজ তারপর রিনরিনে আওয়াজ। কলিংবেল বাজলেই এই কারণে পুষ্প অনেকক্ষণ দরজা খোলে না। বাজুক যতক্ষণ ইচ্ছা! কী সুন্দর লাগে শুনতে!

পরপর তিনবার বাজার পর পুষ্প উঠল। অসময়ে কে হতে পারে? দুপুর আড়াইটায় কে আসবে? রকিব নাকি? মাঝে মাঝে অফিস ফাঁকি দিয়ে সে চলে আসে। বিয়ের পরপর এটা সে বেশি করত, এখন অনেক কমেছে। ছোট ভাইয়া না তো? কল্যাণপুরে ছোট ভাইয়ার বাসা। ভাবীর সঙ্গে প্রচণ্ড রকম ঝগড়া হলে সে এরকম সময়-অসময়ে চলে আসে। একবার রাত বারোটার সময় সে পুষ্পের শ্বশুরবাড়ি এসে উপস্থিত। ভাবির সঙ্গে ঝগড়া করে বাসে করে চলে এসেছে। হাতে কোনো টাকা-পয়সাও ছিল না।

: কে?

: ভাবী আমি। অধমের নাম মিজান। অনেকক্ষণ ধরে বেল টিপছি। যদি মরজি হয় দরজা খুলুন।

পুষ্প লজ্জিত হয়ে দরজা খুলল। তার কাপড়-চোপড় অগোছালো। চুল বাঁধা নেই। এতক্ষণ ঠাণ্ডা মেঝেতে বালিশ এনে শুয়ে ছিল, সেই বালিশ এখনও গড়াচ্ছে।

: ঘুম থেকে তুললাম নাকি ভাবী? মেঝেতে শয্যা পেতেছিলেন মনে হচ্ছে।

: আসুন ভেতরে আসুন। ও তো নেই।

: সে তো ভাবি জেনেই এসেছি যাতে খালিবাসায় আপনার সঙ্গে কিছু রঙ্গ-তামাশা করতে পারি। নাকি আপনার আপত্তি আছে?

পুষ্প কী বলবে ভেবে পেল না। কী অদ্ভুত কথাবার্তা!

: ভাবি মনে হচ্ছে আমার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছেন? দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়ে গেছেন। হা হা হা। খুব ঠাণ্ডা দেখে এক গ্লাস পানি দিন তো! বরফশীতল পানি।

: ঘরে ফ্রিজ নেই। পানি খুব ঠাণ্ডা হবে না।

: তাহলে চা বানিয়ে দিন। আগুন-গরম চা। চিনি দেবেন না।

: একটুও দেব না? চিনি খান না?

: যথেষ্টই খাই। তবে আপনার হাতে খাব না। আপনার বানানো চা এমনিতেই মিষ্টি হবে। হা হা হা।

: আপনি বসুন আমি চা বানিয়ে আনছি।

: আপনার পুত্র কোথায়?

: পাশের ফ্ল্যাটের আপা নিয়ে গেছেন। ওনার মা'র বাসায় গেছেন। সন্ধ্যাবেলা আসবেন।

: তাহলে শুধু আপনি আর আমি এই দুজনই আছি? বাহ্ ভালোই তো!

পুষ্পের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কী অদ্ভুত কথাবার্তা! সে দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকল। তার কেবলই মনে হতে লাগল রকিবের এই বন্ধু রান্নাঘরে উঁকি দেবে। তা অবিশ্যি দিল না। চা বানিয়ে এনে পুষ্প দেখে ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে তার নিচে মিজান দাঁড়িয়ে।



sohell.kazi@gmail.com

: কী জন্যে এসেছি সেটা আগে বলে ফেলি নয়তো কী না কী ভাববেন কে জানে। রকিব বাড়ির কথা বলছিল। সোবাহানবাগে দুটা বাসা আছে। একটা ডাফ বিল্ডিং, উপরে টিন। দুই কামরা, গ্যাস, পানি ইলেট্রিকসিটি সবই আছে। ভাড়া তেরোশো। আরেকটা আছে তিনতলার ফ্ল্যাট। ভাড়া সতেরোশো। মালিকের সঙ্গে আমার চেনাজানা আছে। কিছু কমাবে। আজভাঙ্গ লাগবে না। রকিবকে নিয়ে দেখে এসে মনস্থির করুন। বাহ্, ফাস্টক্লাস চা হয়েছে!

: আপনি দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন কেন, বসুন।

: ভাবী মনে হচ্ছে একটু স্বস্তি পেলেন। এখন ভাবছেন লোকটা রঙ্গ-তামাশা করতে আসেনি। ঠিক করে বলুন তো তো-ই ভাবছিলেন না?

পুষ্প ফ্যাকাশেভাবে বলল, জি না।

: না বললেও বিশ্বাস করব না। চোখ-মুখ কেমন সাদা হয়ে গেছে। ভাবী চলি।

: এখুনি যাবেন?

: যদি যেতে নিষেধ করেন যাব না। সুন্দরী মহিলার নিষেধ অগ্রাহ্য করব এত বড় বোকা আমি না। তবে আজ না ভাবী। ড্রাইভারকে আজ সকাল-সকাল ছেড়ে দিতে হবে। চলি কেমন? ও আচ্ছা, বাড়ির ঠিকানা তো দেয়া হয়নি। কাগজ-কলম আনুন।

মিজান ঠিকানা লিখে সত্যি সত্যি চলে গেল। যাবার আগে বলল, বেয়াদবি হলে নিজগুণে ক্ষমা করবেন ভাবী। আর রকিবকে আমি খবর দিয়ে দেব যাতে সকাল-সকাল অফিস থেকে ফেরে। আজই দেখে আসবেন। দেরি করবেন না। বাড়ির খুব ক্রাইসিস।

রকিব পাঁচটার আগেই ফিরল। চা খেয়েই বাড়ি দেখতে বেরুল। সঙ্গে পুষ্প। বাবুকে নিয়ে নিশাত এখনও ফেরেনি। রকিব বিরক্তমুখে বলল, কার-না-কার কাছে বাচ্চা দিয়ে দাও।

: আগ্রহ করে নিতে চাইলেন।

: আগ্রহ করে কেউ বাচ্চা নিতে চাইলেই বাচ্চা দিয়ে দেবে? চেন না জান না।।

: চিনব না কেন? বাবু খুব খুশি হয়ে গেছে। গাড়িতে চড়তে খুব পছন্দ করে। গাড়ি নিয়ে তো কোথাও যাওয়া হয় না।

: গাড়ি নিয়ে যাওয়া একটা বড় কথা নাকি? মিজানকে বললেই গোটা দিনের জন্য গাড়ি দিয়ে দেবে। খুবই মাইডিয়ার লোক। বন্ধুদের জন্য খুব ফিলিং। দ্যাখো না নিজে কেমন বাড়ি খুঁজে বের করল! হার্ট অব দা টাউনে।

: কেমন বাড়ি কে জানে!

: বাড়ি ভালোই হবে। ওর রুচি ভালো। এলেবেলে জিনিস দেখবে না।

দুটি বাড়ির মধ্যে টিনের বাড়িটা পুষ্পের খুব মনে ধরল। কী ছিমছাম! দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে অল্প খানিকটা জায়গা। এর মধ্যে দুটা কামিনী গাছ একটা পেঁপে গাছ এবং একটা কাঁঠাল গাছ। বড় বড় কাঁঠাল ধরে আছে। রান্নাঘরের পাশে ছোট একটা স্টোররুম আছে। বাড়ির মেঝে কালো সিমেন্টের। তাকালেই কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব আসে। রকিব বলল, মন্দ নয়, কি বল? নেয়া যায় না?

: খুব নেয়া যায়। সুন্দর বাড়ি! খুব সুন্দর!

: গরমে কষ্ট পাবে। টিনের ছাদ।

: টিনের ছাদের বাড়ি রাতের বেলা আরাম হয়। ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তা ছাড়া কেমন সুন্দর বারান্দা। তুমি বিকালে বারান্দায় বসে চা খাবে।

রকিব শব্দ করে হেসে উঠল।



: হাসছ কেন?

: বারান্দায় চা খাওয়ার মধ্যে কী আছে?

: নিশাত আপারা বারান্দায় চা খায়। দেখতে কী ভালো লাগে!

: বারান্দা তো তোমারও আছে, তুমি বসে খেলেই পার।

: মেঝেতে বসে বসে খাব? আমাদের কি ওনাদের মতো চেয়ার-টেবিল আছে?

: হবে, সব হবে। ধীরে ধীরে হবে। আগামী জুন মাস নাগাদ একটা প্রমোশনের কথা আছে।

: সত্যি?

: হুঁ। তেলাতেলির ব্যাপার আছে। ঐটা করতে হবে ভালোমতো।

: করো। সবাই যখন করছে!

: করব তো বটেই। 'তেল' কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী এখন ব্যাটারা বুঝবে।

রকিব সিগারেট ধরিয়ে মহাসুখে টানতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে বাড়ি তারও পছন্দ হয়েছে। পুষ্প মনে মনে বাড়ি সাজাতেও শুরু করেছে। সুন্দর করে পরদা দেবে। কয়েকটা বেতের চেয়ার কিনবে। বাসনপত্র কিনবে। জমানো টাকার কিছুটা সে খরচ করবে। একটা ফ্যান কিনতে হবে। সিলিংফ্যানের কীরকম দাম কে জানে! বলতে গেলে এই প্রথম তার নিজের সংসার। বিয়ের পর দু'বছর কাটল শ্বশুরের সঙ্গে ময়মনসিংহে। রকিব আসত সপ্তাহে সপ্তাহে। কী কষ্ট বেচারার! খাওয়ার কষ্ট। একা একা থাকার কষ্ট। ঢাকায় ফিরে যাবার সময় কী যে মন খারাপ করত!

: পুষ্প!

: কী?

: বাইরে খাবে?

: কোথায়?

: কোন একটা রেস্টুরেন্টে?

: কী যে তুমি বল!

: চলো যাই। মাঝে মধ্যে একটু বাইরে খাওয়া দরকার। রোজ রোজ ঘরের খাওয়া একঘেয়ে হয়ে যাবে। চলো নানরুটি আর কাবাব খাই।

: মাত্র তো সন্ধ্যা। এখন নানরুটি আর কাবাব খাবে?

: নিউমার্কেটে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করি তার পর না হয় যাব।

: আর বাবু? বাবুর কী হবে?

: কী আর হবে? যারা নিয়েছে তারা দেখবে। মজা বুঝুক। ভবিষ্যতে তাহলে আর নেবে না।

নিউমার্কেটে তারা বেশ খানিকক্ষণ ঘুরল। ঠাণ্ডা পেপসি খেল। পুষ্পকে খুবই অবাক করে দিয়ে রকিব একটা শাড়ি কিনে ফেলল। নীল ফুলের ছাপ-দেয়া সুতি শাড়ি। এতেই আনন্দে পুষ্পের চোখে পানি এসে যাবার মতো হল। পুষ্প বলল, বাবুর জন্যে কিছু কিনবে না? কোনো খেলনা-টেলনা।

: আরে ও খেলনার কী বোঝে! খেলনার সময় হোক কিনে দেব।

নিশাত ঘুমন্ত পল্টুকে তার বিছানায় শুইয়েছে। জহির বলল, নিচে একটা অয়েলক্লথ দেয়া দরকার না? আমার তো মনে হচ্ছে বিছানা ভাসিয়ে দেবে।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

নিশাত বলল, অয়েলক্লথ এখন পাব কোথায়?

: ওর বাবা-মা'র আক্কেলটা দ্যাখো-না! রাত ন'টা বাজে এখনও ট্রেস নেই।

: দুজনে মিলে বেড়াচ্ছে। সুযোগ হয় না বোধহয়। তোমাকে কফি করে দেব?

: না।

: খুব কঠিন স্বরে না বললে। তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

: রাগ করব কেন?

: এই যে পরের বাচ্চা নিয়ে আদিখ্যেতা করছি!

: তা কিছুটা অবিশ্য করছ। তোমার যখন এত শখ 'লেট আস হ্যাব এ বেবি'। ওটা তো তেমন কঠিন কিছু না।

নিশাত কিছু বলল না।

জহির বলল, আমি অবিশ্যি এখনও আমাদের অরিজিন্যাল প্ল্যানে বিশ্বাসী। প্রথম পাঁচ বছর ঝামেলাহীন জীবন। দুজন শুধু থাকব, ঘুরে বেড়াব। একজন অন্যজনকে ভালোমতো জানব—

: এখনও আমাকে জানতে পারনি?

: না।

: কোন জিনিসটা জানবার বাকি আছে?

: তোমার মুডের ব্যাপারটা জানি না। অতি দ্রুত তোমার মুড পালটায়। কখন কী জন্যে পালটায় সেটা ঠিক ধরতে পারি না। কিছুটা রহস্য থেকেই যায়।

: কিছু রহস্য থাকাই তো ভালো। জীবন থেকে রহস্য চলে গেলে তো মুশকিল।

জহির বলল, এক কাপ কফি খাওয়া যেতে পারে।

নিশাত রান্নাঘরে ঢুকে পারকুলেটর চালু করল। আর ঠিক তখন কলিংবেল বাজল। পুষ্প এসেছে হয়তো। নিশাত নড়ল না। জহির দরজা খুলে দেবে। ঠিক এই মুহূর্তে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সে এসে তার বাচ্চা নিয়ে চলে যাক। জহির ঠিকই বলেছে, তার মুড খুব দ্রুত পালটায়। এত দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

: আপা!

: এসো পুষ্প।

: বাবুকে নিতে এলাম আপা। আমরা আবার বাড়ি দেখতে চলে গিয়েছিলাম।

: তা-ই নাকি?

: জি। বাসা পছন্দ করে এসেছি। হাফ বিল্ডিং, উপরে টিনের ছাদ।

: টিনের ছাদ? বর্ষাকালে খুব মজা হবে। ঝমঝম করে টিনের ছাদে বৃষ্টি হবে। কফি খাবে পুষ্প?

: খাব। আমরা আজ বাইরে খেয়ে এসেছি। ও বলল চলো বাইরে খাই।

: খুব ভালো করেছ।

: আবার কী মনে করে যেন আমাকে একটা শাড়ি কিনে দিল। টাকা-পয়সার এরকম টানাটানি, এর মধ্যে আবার হঠাৎ শাড়ি। শাড়িটা দেখবেন আপা? নিয়ে আসি?

: আনো।

পুষ্প কফির কাজ নামিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে গেল। যাবার সময় বাবুকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। জহির পাশেই ছিল। জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত করেছে।



জহির হালকা গলায় বলল, আমাকে কোন বিরক্ত করেনি। নিশাতকে হয়তোবা করেছে। আমি ঠিক জানি না।

জহিরের মনে হল দূর থেকে মেয়েটাকে গেঁয়ো মনে হলেও মেয়েটা গেঁয়ো নয়। তার মধ্যে স্বাভাবিক একটা সহজ ভাব আছে এবং মেয়েটি রূপবতী। নিশাতও রূপবতী তবে নিশাতের রূপে কেমন একটা ঠাণ্ডা ভাব আছে। এর মধ্যে সেই শীতল ভাবটা নেই।

নিশাত পুষ্পের জন্য অপেক্ষা করছে। দু'চুমুক দিয়ে সে কফির কাপ নামিয়ে রেখে গেছে। কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে। কাপটা কি একটা পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখবে?

: এ মহিলা তোমাকে ভাবি না ডেকে আপাকে ডাকে কেন?

: জানি না কেন।

: মেয়েটিকে কথাবার্তায় খুব গেঁয়ো কিন্তু মনে হয় না।

: গেঁয়ো বলতে তুমি কী মিন করছ?

: রাস্টিক। রিফাইনমেন্টের অভাব। আরও ব্যাখ্যা চাও?

নিশাত কিছু বলল না।

: দাঁড়াও আরেকটা ব্যাখ্যা দিই। মনে করো একটা প্লেটে লাল টুকটুকে একটা আপেল। একজন সেই আপেলের সৌন্দর্য প্রথম দেখবে, অন্যজন আপেলটাকে দেখবে শুধুই খাদ্য হিসেবে।

: আপা আসব?

: এসো, তোমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

: আমি কফি খাব না আপা, ভালো লাগে না।

: পুষ্পের হাতে শাড়ির প্যাকেট। সে অস্বস্তি বোধ করছে। আড়চোখে তাকাচ্ছে জহিরের দিকে। এই মানুষটির সামনে শাড়ির প্যাকেট খোলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। নিশাত জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি দয়া করে পাশের ঘরে যাবে? আমরা একটা মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে আলাপ করব, তোমার হয়তো ভালো লাগবে না।

জহির পাশের ঘরে চলে গেল। দরজা ভিড়িয়ে দিল। নিশাত নিজেই শাড়ির প্যাকেট খুলছে।

: বাহ্ চমৎকার তো! বাংলাদেশে শাড়ির ডিজাইন অনেক উন্নত হয়েছে। সিম্পলের মধ্যে এরা ভালো জিনিস করছে।

: আপনার পছন্দ হয়েছে আপা?

: খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার! নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা ফুল থাকলে মনে হয় আরও সুন্দর হত। আকাশে তারা ফুটে আছে এরকম একটা এফেক্ট পাওয়া যেত। আমি বেশ ক'টা শাড়ির ডিজাইন জমা দিয়েছিলাম বিসিকে। একবার খোঁজ নিতে হবে ওরা নিল কি না।

: আপনি শাড়ির ডিজাইন জমা দিয়েছিলেন? ওমা কী বলছেন!

: কেন জমা দেব না! আমি কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্রী। একদিন তোমাকে আমার আঁকা ছবি দেখাব।

পুষ্প মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে। নিশাত সেই মুগ্ধ দৃষ্টির তিকে তাকিয়ে আরেকবার মনে-মনে বলল, কী সুন্দর মেয়েটি!

## ৪

পুষ্প ঠাণ্ডা মেঝেতে হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে। তার চমৎকার লাগছে। দুপুরবেলার এই সময়টার মধ্যে কোন-একটা রহস্য আছে। সময়টাকে খুব আপন মনে হয়। সারা শরীরে থাকে ঘুম-ঘুম আলস্য। ঘুমুতে ইচ্ছা করে আবার জেগে থাকতেও ইচ্ছা করে।



sohell.kazi@gmail.com

বাবু ঘুমুচ্ছে। তার ঘুমুবার ভঙ্গিটা খুব বিশ্রী। হাঁ করে ঘুমায়। আজও হাঁ করে আছে। পুষ্প খুব সাবধানে মুখের হাঁ বন্ধ করে দিল। অভ্যাস হয়ে গেলে মুশকিল। বাচ্চ হয়েও যদি হাঁ করে ঘুমায় তাহলে তো সর্বনাশ!

বাবু ঘুমের মধ্যেই হাত দিয়ে মাকে একটা ধাক্কা দিল। পুষ্প গম্ভীর গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে? মা'র গায়ে হাত তোলা হচ্ছে। খুব খারাপ। আমি কিন্তু রাগ করলাম। তোমার সঙ্গে আর কোন কথা হবে না। না না না।

ঘুমন্ত ছেলের সঙ্গে পুষ্প মাঝে মাঝে সময় ধরে একতরফা কথাবার্তা বলে। টেনে টেনে অনেকটা গান গাওয়ার ভঙ্গিতে। শেষের দিকে কথাগুলো বলা হয় মিল দিয়ে দিয়ে।

খোকন সোনা
কথা বলে না,
শুধু ঘুমায়, মাথা নাড়ায়
আবার হাসে, ভালোবাসে ॥

এই ব্যাপারগুলো ছেলে জেগে থাকা অবস্থায় বা ছেলের বাবার উপস্থিতিতে পুষ্প কখনো করে না। তার খুব লজ্জা লাগে। এই বাবু তার নিজের, অন্য কারোর নয়—এর মধ্যেও যেন খানিক লজ্জা আছে। এই বাবু অন্য কারোর হলে সে বোধহয় আরও বেশি ভালোবাসতে পারত।

খুব অল্প সময়ের জন্য কলিংবেল বাজল। নিশ্চয়ই নিশাত আপা। নিশাত আপা কলিংবেলটা ছুঁয়েই হাত সরিয়ে নেন। ঘরের ভেতর থেকে কে কে বলে চেঁচিয়ে মরলেও সাড়া দেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরেকবার বেল টেপেন।

পুষ্প দ্বিতীয়বার বেল টেপার জন্যে অপেক্ষা করল না। উঠে দরজা খুলে দিল। নিশাত নয় মিজান দাঁড়িয়ে। চোখে সানগ্লাস। চুল উসকোখুসকো।

: কী, ভেতরে আসতে বলবেন, না বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?

: ভাই আসুন।

: আমি হচ্ছি অসময়ের অতিথি। আজও দেখি মেঝেতে শয্যা পেতেছেন। মেঝেতে ঘুমুতে বুঝি খুব আরাম?

পুষ্প হাসল। মিজান বলল, আমিও একদিন শুয়ে দেখব। চট করে একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি আনুন। হিমশীতল।

: খুব ঠাণ্ডা হবে না।

: ও আচ্ছা আচ্ছা, মনে থাকে না। তাহলে চা। আপনার পুত্র দেখি আজ এখানেই আছে। কেউ নিয়ে যায়নি?

: জি না।

: সুন্দর ছেলে আপনার। মা'র বিউটি পেয়েছে। বাবার মতো হয়নি এটা একটা ভালো ব্যাপার। হা হা হা। রাগ করলেন না তো ভাবি?

: জি না। রাগ করব কেন?

: বসতেও তো বলছেন না!

: বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি।

: দেরি করবেন না, আমার হাতে সময় বেশি নেই।

পুষ্প চা বানিয়ে নিয়ে এল। লোকটির ওপর আজ আর প্রথমদিনের মতো রাগ হচ্ছে না। কত ঝামেলা করে সুন্দর একটা বাসা জোগাড় করেছে। আজকালকার যুগে কে আর বন্ধুদের জন্যে কিছু করে! কেউ করে না।



: চিনি হয়েছে?

মিজান চুমুক না দিয়েই বলল, হয়েছে। যতটুকু মিষ্টি হবার কথা তার চেয়েও বেশি হয়েছে। ভাবি আপনি বসুন। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

পুষ্প বসল। মিজান বলল, মাথায় এমন ঘোমটা দিয়ে বসেছেন কেন? আমাকে লজ্জা করছেন নাকি?

: জি না।

: গুড, লজ্জা করবেন না। ঘোমটা ফেলে দিন। এই তো চমৎকার, ইন্দ্রাণীর মতো লাগছে। বুঝলেন ভাবি, খুব সুন্দরী যেসব তরুণী আছে তাদের বিয়ে করা উচিত নয়। মোটেই উচিত নয়।

: উচিত নয় কেন?

: সৌন্দর্য হচ্ছে সবার জন্যে—একজন পুরুষের জন্য নয়। প্রাচীন মিশরের একটা নিয়ম কী ছিল জানেন? সবচেয়ে সুন্দরী রমণীদের নাচে-গানে শিক্ষিত করে তোলা হত। তাদেরকে আলাদা করে রাখা হত সব পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এরা হত জনপদবধূ। Lady of the town.

পুষ্প হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই মানুষটি এইসব কথা বলছে কেন?

: ভাবী!

: জি।

: শুনলাম বাসা নাকি আপনাদের পছন্দ হয়েছে।

: জি হয়েছে। খুব সুন্দর বাসা।

: ধন্যবাদ তো দিলেন না।

: ধন্যবাদ।

: শুধু ধন্যবাদ, এর বেশি কিছু না? আপনি দেখছি হার্টলেস!

পুষ্প কী বলবে ভেবে পেল না। বাবুর দিকে তাকাল। বাবুর উঠে পড়ার সময় হয়েছে। এক্ষুণি হয়তো উঠবে। সে মনে মনে বলল—"বাবু ওঠ।"

: ভাবী!

: জি।

: এবার তাহলে বিদায় দিন।

: আবার আসবেন।

: নিশ্চয়ই আসব। যাই তাহলে? যেজন্য এসেছিলাম তা অবিশ্যি এখনও বলা হয়নি। যদি অনুমতি দেন তাহলে বলি।

পুষ্প ক্ষীণ স্বরে বলল, বলুন?

: ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

পুষ্পের ইচ্ছা করছে লোকটাকে কিছু কড়া কথা বলতে। সে যা করছে তাকে ঠিক ঠাট্টা হিসেবে সে নিতে পারছে না। এইভাবে কেউ ঠাট্টা করে না। ঠাট্টা বোঝার মতো বয়স তার হয়েছে।

: এইরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন কেন ভাবী? আপনার কি ধারণা আমি আপনাকে ভয়ানক কিছু বলব? অবসিন কিছু?

: জি না, তা কেন বলবেন?

: বলতেও তো পারি। হা হা হা।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

হাসির শব্দে পল্টুর ঘুম ভেঙে গেল। অপরিচিত লোকটিকে সে কিছুক্ষণ দেখল। কেঁদে ওঠার উপক্রম করেই মত বদলালো। হাসিমুখে হামাগুড়ি দিয়ে মার কাছে আসতে লাগল।

মিজান উঠে দাঁড়াল। হালকা গলায় বলল, চলি ভাবী, আমি যে এসেছিলাম এটা রকিবকে বলবেন না। কী না কী মনে করে বসবে। স্বামীরা আবার খুব ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

মিজান চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই রকিব এসে পড়ল। রকিবের মুখ হাসি হাসি। এরকম হাসিমুখ তার সচরাচর থাকে না। খুশির কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই হয়েছে।

: মিজান এসেছিল নাকি?

: হ্যাঁ।

: খুব জ্বালিয়ে গেছে, না? হা হা হা। ব্যাটা প্লান করে এসেছে। আমার সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা বাজি তোমাকে কাঁদিয়ে দেবে। কাঁদাতে পেরেছে? কেঁদেছিলে? আমি বললাম, কাঁদাতে পারবে নারে বাবা! শক্ত চিজ। সে বলল পারবেই। তারপর বলো রেজাল্ট কী? পাস না ফেল?

পুষ্প জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল।

: মিজান এইরকমই। কলেজ লাইফ থেকে দেখছি। দারুণ ফূর্তিবাজ ছোকরা। কাপড় পরো। কুইক, ভেরি কুইক। সময় নেই।

: কোথায় যাবে?

: মিজান কিছু বলেনি?

: না।

: আরে এই ব্যাটা তোমার কাছে এসেছে কেন? তার গাড়ি রেখে যাওয়ার জন্যে। গাড়ি রেখে গেছে। বারান্দায় গিয়ে দেখ ক্রিম কালারের গাড়ি উইথ ড্রাইভার।

: গাড়ি দিয়ে কী হবে?

: ঘুরব। চিড়িয়াখানা-ফিরিয়াখানা যাব। পল্টু নাকি গাড়ি পছন্দ করে। যাও যাও দেরি করবে না। দুই-একজন আত্মীয়স্বজনের বাসাও যাওয়া যায়, কী বল? গাড়ি যখন পাওয়া গেছে বড়লোকি কায়দা করা যাক। রাত ন'টা পর্যন্ত গাড়ি রাখা যাবে।

বড়লোকি কায়দা তারা ভালোই করল। চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, বলধা গার্ডেন সব একদিনে। পল্টু মহাখুশি। জে জে জে জে করে নিজের মনে গান গেয়ে যাচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে মাথা বের করবার চেষ্টা করছে। হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। রকিবও খুশি। সে পাঁচটা বেনসন সিগারেট কিনেছে। গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে সিগারেট খাবার মজাই নাকি আলাদা। এর মধ্যে চারটা সিগারেট শেষ। মাঝে মাঝে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে।

: তেল আছে তো ড্রাইভার?

: জি স্যার আছে।

: তেল শেষ হয়ে গেলে বলবেন। তেল কিনব। নো প্রবলেম। দেশ কোথায় আপনার?

: বিক্রমপুর।

: খুব ভালো জায়গা। বিক্রমপুরে অনেক গ্রেটম্যানের জন্ম হয়েছে। জগদীশচন্দ্র বসু, নাম শুনেছেন?

: জি না।

: সাইনটিস্ট। বিরাট সাইনটিস্ট।



পুষ্পেরও খুব ভালো লাগছে। হাওয়ায় তার চুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে সে খানিকটা বিব্রত। তা ছাড়া বাবুকে সামলাতে হচ্ছে। অতিরিক্ত উৎসাহে সে খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে কি না সেটাও দেখতে হচ্ছে। পুষ্প বলল, সাজার স্মৃতিসৌধে যাবে? দেখিনি কখনো।

: চলো যাওয়া যাক। অসুবিধা কী? অন্য কোথাও যদি যেতে চাও যেতে পার। ন'টা পর্যন্ত গাড়ি থাকবে। বলা আছে।

: ওনার অসুবিধা হবে না?

: হলে হবে। ড্রাইভার সাহেব, একটু গাড়িটা থামান তো। আরও কয়েকটা সিগারেট কিনব। আপনার গাড়িতে ক্যাসেট আছে না?

: জি স্যার।

: আরে তাহলে এতক্ষণ চুপচাপ কেন? গান লাগিয়ে দিন। কী বল পুষ্প, গান-বাজনা শুনতে শুনতে যাই? ফাইন হবে।

পুষ্প হাসল। ছেলে এবং স্বামী এই দুজনের মধ্যে এই মুহূর্তে কে বেশি খুশি সে ধরতে পারছে না। দুজনেরই চোখ ঝলমল করছে। ড্রাইভার ক্যাসেট চালু করেছে। গানের আওয়াজ কী পরিষ্কার! পুষ্পের চোখ ভিজে উঠছে। কে জানে একদিন এরকম একটা গাড়ি তারা কিনতে পারবে কি না! নিজেদের গাড়িতে গা এলিয়ে বসে গান শুনতে শুনতে দূর দূর জায়গায় বেড়াতে যাবে। চিটাগাং, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি। তাদের সঙ্গে ক্যামেরা থাকবে। কোন-একটা জায়গা পছন্দ হলেই গাড়ি থামিয়ে তারা ছবি তুলবে। ফ্লাস্কে চা থাকবে। মাঝে মাঝে চা খাওয়া হবে। বাবু ঘুমিয়ে পড়বে। সে বলবে একটু আস্তে চালান ড্রাইভার সাহেব, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। একদিন এরকম তো হতেই পারে। মানুষের কিছু কিছু কল্পনা তো পূর্ণ হয়। বিয়ের আগে পুষ্প কল্পনা করত নম্র, লাজুক একটা ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। ছেলেটি রাত জেগে কত গল্প করছে তার সঙ্গে! ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে কিন্তু ছেলেটি তাকে ঘুমুতে দিচ্ছে না। একের পর এক গল্প বলেই যাচ্ছে।

পুষ্পের এই কল্পনাটা খুব মিলে গিয়েছিল। বিয়ের পর তিন মাস রকিব অনবরত কথা বলেছে। পুষ্প ধারণাই করতে পারেনি একজন পুরুষ মানুষের পেটে এত কথা থাকতে পারে। সবই তার নিজের গল্প। খুব ছোটবেলায় তার বন্ধুরা তাকে ধাক্কা দিয়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল এই গল্প কম হলেও পাঁচবার শুনিয়েছে। বেচারা উঠতে যায় আবার তার বন্ধুরা ধাক্কা দিয়ে তাকে পানিতে ফেলে দেয়। সে ধরেই নিয়েছিল মারা যাবে।

প্রথমবার এই গল্প শুনে সমবেদনায় পুষ্পের চোখ ভিজে উঠেছিল। শেষের দিকে কেন জানি হাসি পেত। সেই হাসি লুকানোর জন্যে খুব কষ্ট করতে হত। পুষ্পের নিজেরও কত কথা বলতে ইচ্ছে করত। সুযোগই পেত না। হয়তো কোন-একটা গল্প শুরু করেছে, অল্প কিছু দূর আগাবার পরই রকিব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, একটু দাঁড়াও আমার নানার বাড়িতে আমাকে একবার একটা রাজহাঁস কামড় দিয়েছিল। এই গল্পটা বলে নিই, পরে মনে থাকবে না, ভুলে যাব।

রাজহাঁস কামড়ের গল্প পুষ্প আগেও শুনেছে তবু ভান করল যেন এই প্রথমবার শুনছে। চোখ বড় বড় করে বলল, তারপর কী হল? কী ভয়ংকর! তুমি গাছে উঠে গেলে?

কিছু কিছু কল্পনা মিলে যায় আবার কিছু কিছু মেলে না। না-মেলা কল্পনার সংখ্যাই বোধহয় একজন মানুষের জীবনে অনেক বেশি। গাড়ি কেনার কল্পনাটা হয়তো মিলবে না। পুষ্প ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল।



sohell.kazi@gmail.com

ড্রাইভার বলল, এখন কোনদিকে যাব?

রকিব বলল, কোন দিকে না, রাস্তায় চক্কর দাও। আর শোনো, ইংরেজি ভালো লাগছে না, বাংলা কোন গান থাকলে দাও।

: আধুনিক না রবীন্দ্রসংগীত?

: রবীন্দ্রই চলুক। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গান।

পুষ্প চোখ বন্ধ করে গান শুনছে। বাবু তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যাসেটে একটি মেয়ে কোমল স্বরে গাইছে, "এসো করো স্নান নবধারা জলে।" আহ্, বেঁচে থাকা কী সুখের!

পুষ্প একটু সরে এল রকিবের দিকে, নিচুগলায় বলল, চলো না একটু যাত্রাবাড়ীর দিকে যাই। যাবে? রাত তো বেশি হয়নি।

: ওখানে কী?

: ছোটমামার বাসা। নানিজান হয়তো এসেছেন ছোটমামার বাসায়। দেখা করে আসি। কতদিন নানিজানকে দেখি না।

: আরে দূর, বাদ দাও। চিপা গলি, আমার গাড়িই ঢুকবে না।

রকিব এমনভাবে 'আমার গাড়ি' বলছে যেন এটা সত্যি সত্যিই তার গাড়ি। গানের সঙ্গে মাথা দোলাচ্ছে। পা নাচাচ্ছে।

: কাচটা তুলে দাও তো পুষ্প। একটা সিগারেট ধরাব। হ্যান্ডেলটা ধরে ঘুরাও, কাচ অটোম্যাটিক উঠবে।

: তুমি আজ এত সিগারেট খাচ্ছ কেন?

: রোজ তো আর খাই না। ওয়ান্স ইন এ হোয়াইল। তুমি একটা টান দিয়ে দেখবে নাকি? টেস্ট করবে?

: কী যে বল পাগলের মতো!

: পাগলের মতো কী আবার বললাম, বিদেশে মেয়েরাই এখন সিগারেট খায়। পুরুষরা ক্যান্সারের ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

: তুমি ছাড় না কেন? তোমার ক্যান্সারের ভয় নেই?

: আরে দূর, আমি হচ্ছি ছোট মানুষ। ছোট মানুষের ছোট অসুখ। আমার হবে সর্দি, আমাশা, গেঁটেবাত এইসব—হা হা হা।

হাসির শব্দে পল্টু জেগে উঠেছে। জেগেই আর সে দেরি করল না। তারস্বরে কাঁদতে শুরু করল। রকিব বিরক্তমুখে বলল—একটা চড় দাও তো! দাও একটা চড়।

: চড় দেব কেন? কী করেছে সে?

: ভ্যা ভ্যা করছে শুনছ না?

: করুক।

পুষ্প ছেলেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। সে কিছুতেই পোষ মানছে না। গলার আওয়াজ বাড়ছেই। রকিব বিরক্তমুখে তাকিয়ে আছে। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে।

## ৫

জহিরের দাড়ি শেভ করবার ব্যাপারটা দেখার মতো। মোটামুটি একটা রাজকীয় আয়োজন। বারান্দায় ছোট্ট টেবিল আনা হয়, আয়না লাগানো হয়। গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি, স্যাভলন, ব্রাশ, সাবান, রেজার, আফটার শেভ। সব নিয়ে আসার পর গালে সাবান লাগানোর পালা। এই দৃশ্যটিও মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। জহির ব্রাশ ঘষছে তো ঘষছেই।



মুখ সাবানে ভরে উঠছে তবু ব্রাশ ঘষার বিরাম নেই। নিশাত একবার অবাক হয়ে বলেছিল, এরকম তুচ্ছ একটা ব্যাপারে এত সময় নষ্ট কর?

: দাড়ি কাটা তুচ্ছ মনে হল তোমার কাছে?

: কেটে ফেলে দিচ্ছ এটা তুচ্ছ না?

: না। এর নাম বিসর্জন। আয়োজন ছাড়া বিসর্জন হয় না।

বিয়ের আগে জহিরের এই দিকটি নিশাতের চোখে পড়েনি। শুধু দাড়ি কাটা নয়, সব ব্যাপারেই জহিরের আয়োজনের বেশ বাড়াবাড়ি আছে। অফিসে যাবার ব্যাপারটাই ধরা যাক। পালিশ করা জুতাও সে পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে অনেকক্ষণ ঝাড়পোছ করবে। রুমাল ইস্ত্রি করবে। সাজসজ্জা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে আয়নার সামনে। এই ব্যাপারগুলো বিয়ের আগে নিশাতের চোখে পড়েনি। চোখে পড়েছে যে এই মানুষটি খুব ফিটফাট। রুচিবান একজন মানুষ যার গায়ে কখনো ইস্ত্রি ছাড়া কাপড় দেখা যায় না। যার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সব সময় আফটার শেভ লোশনের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধটা ভালো লাগে।

জহির টাই বাঁধতে বাঁধতে নিশাতের ঘরে ঢুকল। নিশাতের ঘর মানে তার স্টুডিও। ছবি আঁকার সরঞ্জামে ঠাসা একটা ঘর। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছবির স্তূপ। নিশাত একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে। গত দু'দিন এই ছবিটির জন্যে বেশ কিছুটা সময় দিয়েছে। লাইনওয়ার্ক শেষ হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় রং পড়েছে।

জহির অবাক হয়ে বলল, কার পেইন্টিং?

নিশাত বলল, চিনতে পারছ না?

: পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার?

: মহিলা বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? বাচ্চা একটা মেয়ে।

: ওর ছবি আঁকছ কেন?

: কোনো বাধা আছে?

: বাধা থাকবে কেন? জানতে চাচ্ছি।

নিশাত হাসল। ছবিটির দিকে তাকিয়ে হাসল। ভালো হচ্ছে। অনেকদিন পর নিজের কাজ তার পছন্দমতো এগুচ্ছে। মন লেগে গেলে কাজ খুব দ্রুত আগায়। অনেক দিন ধরেই কোনকিছুতেই মন বসছে না। নিশাত চাকু দিয়ে পোট্রেটের চুল থেকে কিছু রং ঘষে ঘষে তুলছে। চুল ঠিক আসছে না। মেয়েটির চুল ফ্লাফি ধরনের। এলোমেলো হয়ে থাকে, এখানে মনে হচ্ছে খুব গোছানো চুল।

: নিশাত!

: বলো।

: আমার পোট্রেটে কবে হাত দেবে?

: দেব খুব শিগগিরই।

: একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ নিশাত? পুরুষ-শিল্পীরা তাঁদের স্ত্রীদের মডেল বানিয়ে অসংখ্য ছবি আঁকেন। অথচ মহিলারা কখনো তাঁদের স্বামীদের মডেল বানান না।

: আমি তোমার ছবি আঁকিনি বলে অন্যরাও আঁকবে না এমন তো কথা নয়। কেউ কেউ নিশ্চয়ই আঁকে।

: কেউ আঁকে না। মেয়েদের এই সাইকোলজিটা বেশ অদ্ভুত। আমার কলমটা পাচ্ছি না। একটু দেখবে?

: টেবিলের উপরই তো থাকে।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: এখন নেই। তোমার বান্ধবীর পুত্র নিয়ে যায়নি তো?
: ও কলম নিয়ে কী করবে?
: কিছু করবে না। হাতের কাছে পেয়েছে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কাইন্ডলি একটু খুঁজে দ্যাখো। কলপয়েন্টে আমি লিখতে পারি না।
: অফিসে ফেলে আসেনি তো?
: অফিসে কি আমি কখনো কিছু ফেলে আসি?
: তা আস না। দাঁড়াও দেখি পাই কি না।
: থাক তোমাকে উঠতে হবে না। ছবি নিয়ে বসেছ, ডিস্টার্ব করতে চাই না। শিল্পীমানুষ, মুড কেটে গেলে মুশকিল।
: ঠাট্টা করছ?
: পাগল!

জহির ঘর থেকে বেরুল বিরক্তমুখে। নিশাত তাকে এগিয়ে দিতে আসেনি। এটা কেন হচ্ছে জহির বুঝতে পারছে না। সম্পর্কে শীতলতা কি আসতে শুরু করেছে? নাকি জীবনযাপনে মনোটনি? জহিরের প্রতি তার আগ্রহ কি কমে আসছে? কিছুটা নিশ্চয়ই কমেছে।

অফিসে পৌঁছেই জহির টেলিফোন করল। কিছু কিছু কথা আছে মুখোমুখি বলা যায় না অথচ টেলিফোনে খুব সহজেই বলা যায়।

: নিশাত!
: হ্যাঁ?
: কী করছ?
: তেমন কিছু না। গল্প করছি।
: কার সঙ্গে গল্প করছ?
: পুষ্প।
ও আচ্ছা, তাহলে তুমি ব্যস্ত।
: কিছু বলবে?
: না।
: তোমার কলমটা পাওয়া গেছে।
: কোথায় ছিল?
: যেখানে থাকার কথা সেখানেই ছিল। টেবিলের উপর। তুমি ভালো করে দেখনি। তোমার জন্যে যা খুব আনইউজুয়েল।
: তা তো বটেই।
: টেলিফোন রাখছি, কেমন?

জহির রিসিভার হাতে অনেকক্ষণ বসে রইল। নিশাত কখনো আগে টেলিফোন রাখে না। তার কাছে নাকি এটাকে অভদ্রতা মনে হয়। কিন্তু আজ সে সেই অভদ্রতাটাই করল, একবার জিজ্ঞেসও করল না টেলিফোন কেন করেছে।

পুষ্প খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পল্টু ঘরময় চক্রাকারে হামাগুড়ি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পারছে না। ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে। কিছুটা ব্যথা নিশ্চয়ই পাচ্ছে কিন্তু কাঁদছে না। আবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিশাত ব্যাপারটা খুব আগ্রহ দিয়ে লক্ষ্য করছে। শিশুদের মধ্যে এত অধ্যবসায় থাকে তা তার জানা ছিল না। জীবনের পরবর্তী সময়ে এই অধ্যবসায়টা থাকে না কেন কে জানে!



পুষ্প বলল, আপা, আমি যে প্রায়ই আপনার এখানে আসি আপনি রাগ করেন না তো?
: না, করি না।
: বিরক্ত হন নিশ্চয়ই।
: মাঝে মাঝে হই। সবসময় হই না।

পুষ্প মনখারাপ করে ফেলল।

নিশাত বলল, খুব প্রিয়জনদের ওপরও আমরা মাঝে মাঝে বিরক্ত হই। হই না? আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার বাবা। মাঝে মাঝে বাবার ওপরও বিরক্ত হই। কাজেই তোমার এমন মুখ কালো করার কিছু নেই।

: আপনার বাবা বুঝি আপনাকে খুব ভালবাসেন?
: তা বলতে পারব না। হয়তো বাসেন। ওনার একটা গল্প তোমাকে বলব—শুনবে?
: বলুন।
: আমি তখন খুব ছোট। ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভে পড়ি। বাবা কী জন্যে জানি বকা দিয়েছেন। আমি খুব কাঁদছি। বাবা এসে বললেন, এখন থেকে নিয়ম করে দিলাম যে আমার বকা খেয়ে কাঁদবে তাকেই একটা উপহার দেব। সত্যি সত্যি চমৎকার একটা পুতুল কিনে আনলেন। এর পর থেকে ভাইবোনদের কেউ বকা খেয়ে কাঁদলেই দামি উপহার।
: ওমা কী মজা!
: আসল মজাটা এখনও বলিনি। কিছুদিন পর কী হল জান? বাবা বকা দিলে আমরা কেউ কাঁদতে পারি না। কারণ বকা খেয়েছি উপহার পাব এই আনন্দে এতই খুশি হয়ে যাই যে কান্না চলে যায়। আর না কাঁদলে তো উপহার নেই।
: কী সুন্দর গল্প!
: এরকম সুন্দর সুন্দর গল্প অনেক আছে। সব আমার বাবাকে নিয়ে। মাঝে মাঝে তোমাকে বলব।
: এখন একটা বলুন না!
: না, এখন না। তুমি বরং তোমার বাবা সম্পর্কে বলো।
: আমার বাবা সম্পর্কে বলার মতো কিছু নেই আপা। খুব সাধারণ মানুষ। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের দিকে কখনো ফিরেও তাকাননি। মা মরে যাবার একুশ দিনের দিন আবার বিয়ে করেছেন। সংসার নাকি অচল হয়ে যাচ্ছে— বিয়ে না করলেই না।
: তুমি তখন কত বড়?
: ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। একটা ছেলে আছে। আর আমাদের বোনদের বিয়ে কীভাবে হয়েছে জানেন আপা? ছেলে দেখতে এসেছে। বোনরা সবাই খুব সুন্দর তো, কাজেই দেখতে এসেই পছন্দ হয়ে গেছে। তখন বাবা বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, বিয়ে হয়ে যাক। শুভস্য শীঘ্রম। কাজি ডেকে বিয়ে।
: তোমার বাবা মনে হয় খুব করিৎকর্মা মানুষ।
: মোটেই না আপা। টাকা বাঁচানোর ফন্দি। বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হল না। আমাদের তিন বোনের বিয়ে হয়েছে। কারও বিয়েতে অনুষ্ঠান হয়নি। বরপক্ষের ওরা অনুষ্ঠান করতে চেয়েছে। বাবা বলেছেন— বিয়ে তো হয়েই গেছে, আবার অনুষ্ঠান কিসের? মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যান।
: তোমার মনে হয় বাবার ওপর খুব রাগ।
: আগে রাগ হত এখন হয় না।



sohell.kazi@gmail.com

: এখন হয় না কেন?
: জানি না আপা। এখন কেমন যেন মায়া লাগে। সেও তো গরিব মানুষ আপা। কোথা থেকে টাকা খরচ করবে?
: তা তো বটেই।

নিশাত অবাক হয়ে দেখল পুষ্পের চোখে পানি এসে গেছে। মনে হচ্ছে সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। খুবই সেনসিটিভ মেয়ে তো!

: পুষ্প!
: জি?
: চা খাবে?
: না আপা।
: তুমি কি খুব একা একা থাক পুষ্প?
: হ্যাঁ। ও কোথাও যাওয়া পছন্দ করে না কাজেই কোথাও যাই না। কেউ আসেও না আমাদের এখানে। শুধু ওর এক বন্ধু আসে মাঝে মাঝে। তাঁকে আমার পছন্দ হয় না। শুধু আজেবাজে কথা বলে।
: স্বামীর বন্ধুরা বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে সব সময় এরকমই করে। জহিরের এক বন্ধু আছে, মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে যে ইচ্ছে করে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই।

পুষ্প হেসে ফেলল। বেশ শব্দ করে হাসি। হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বলল, অসময়ে উনি বাসায় আসেন, কেন জানি আমার ভালো লাগে না।

: অসময়ে মানে কখন?
: দুপুরের পর, আড়াইটা-তিনটার দিকে।
: তুমি ওনাকে বলবে যেন অসময়ে না আসেন।
: ও আবার রাগ করবে। পল্টুর বাবার কথা বলছি। ওর চট করে রেগে যাবার অভ্যাস আছে।
: তুমি তোমার অসুবিধার কথাটা বলছ, এতে ওনার রাগ করবার তো কিছু নেই।
: আমি তা বলতে পারব না আপা। তা ছাড়া মিজান সাহেব মানুষ হিসেবে খুব ভালো। সবার সঙ্গে রসিকতা করা ওনার অভ্যাস। ওনার মনে কোন পাপ নেই।
: তা-ই বুঝি?
: জি আপা।
: তুব তুমি ওনাকে বলবে যেন অসময়ে না আসেন। আমাদের দেশটা তো বিলেত-আমেরিকা নয়। এদেশের নিজস্ব নিয়ম-কানুন আছে। ডিসেনসির ব্যাপার আছে। তা-ই না?

পুষ্প কিছু বলল না। নিশাত বলল, তোমার ওনাকে কেমন লাগে?

: আমার পছন্দ হয় না।
: অতিরিক্ত মেলামেশার একটা সমস্যা কী জান? কোন-না-কোনভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যে লোকটাকে শুরুতে অসহ্য বোধ হয় একসময় দেখা যায় তাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে।
: কী যে বলেন আপা!
: আমি ঠিকই বলি। পনেরো-ষোলো বছরের বাচ্চা মেয়েকে আমি দেখেছি বুড়ো গানের মাস্টারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার নিজের কথা বলব?



: বলুন।
: না থাক। সব কথা একদিনে বলতে নেই। কিছু কথা আরেক দিনের জন্যে তোলা থাকুক।

টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। নিশাত টেলিফোন ধরল। ওপাশে জহিরের গলা।

: নিশাত!
: বলো শুনছি।
: কী করছিলে?
: তেমন কিছু না। তোমার কী হয়েছে বলো তো? একটু পরপর— কী হয়েছে?
: ভালো লাগছে না।
: ভালো না লাগলে চলে এসো।
: আমি ভাবছিলাম কি, বাইরে কোথাও গেলে কেমন হয়। ধরো রাঙ্গামাটি বা কক্সবাজার।
: হঠাৎ?
: না, মানে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের সম্পর্কটা একটু কোল্ড যাচ্ছে।
: এরকম ধারণা হবার কারণ কী বলো তো?
: না মানে ...
: যেতে চাইলে চলো যাই। ঘুরে আসি। আমার তো কোনো কাজ নেই, আমি তো ঘরেই বসে থাকি।
: তাহলে চলে এসো-না!
: আচ্ছা আসছি। টেলিফোন রাখলাম, কেমন?

নিশাত রিসিভার নামিয়ে হাসতে শুরু করল। মনের কিছু দরজা-জানালা এখন খুলতে শুরু করেছে। নিশাত পল্টুকে কোলে নিয়ে গায়ের ঘ্রাণ নিল। কী অদ্ভুত গন্ধ শিশুদের গায়ে!

৬

পুষ্পদের বাড়িওয়ালা আওলাদ সাহেব একজন স্কুল-টিচার। স্কুল-টিচার হয়েও তিনি শুধুমাত্র নিজের রোজগারে ঢাকায় দুটি বাড়ি করেছেন। একটি সোবহানবাগে অন্যটি কল্যাণপুরে। কল্যাণপুরের বাড়িতে তিনি নিজে থাকেন। সোবহানবাগের বাড়িটা ভাড়া দেন। বর্তমানে চেষ্টা তদবির করছেন লোনের জন্য। লোন পেলেই বাড়ি ভেঙে চারতলা দালান তুলবেন। এই ব্যাপারটা তিনি অনেকক্ষণ ধরে রকিবকে বোঝাচ্ছেন। মাস্টারদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে তারা সবাইকে তাদের ছাত্র মনে করে এবং মনে করে কেউ তাদের কথা বুঝতে পারছে না। আরও ভালোমতো বোঝানো দরকার। তিনি যে এই বাড়ি ভেঙে চারতলা দালান তুলতে চান এটা রকিবকে বেশ কয়েকবার বললেন।

: লোন পেয়ে গেলেই বাসা ছাড়তে হবে, বুঝতে পারতেছেন তো?
: জি পারছি।
: তখন এই অসুবিধা সেই অসুবিধা, এইরকম সতেরো ধরনের কথা বলতে পারবেন না।
: বলব না।
: এইসব মুখের কথা সবাই বলে, কাজের সময় না। আমার বড় শ্যালক একটা বাড়ি করেছিল বুঝলেন। একটা ভালো পার্টির কাছে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে। পার্টি এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে দিল। তারপর আর ভাড়া দেয় না। বাড়া চাইতে গেল বলে, ভাড়া দেব কেন? বাড়ি কিনে নিলাম না?



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: বলেন কী!
: এই হচ্ছে দেশের অবস্থা!
: তারপর আপনার বড় শ্যালক কী করলেন?
: মামলা-মোকদ্দমা করছে, আর কী করবে! দু'বছর হয়ে গেল এক পয়সা ভাড়া দেয় নাই।
: আমাকে দিয়ে ঐ ভয় নাই। এক তারিখে বেতন পাব দুই তারিখে বাড়ি ভাড়া শোধ। সামনের মাসের এক তারিখে চলে আসব।
: এই মাসটা আমি কী করব? আসতে হয় এই মাসে আসবেন। গোটা মাসের ভাড়া দেবেন। আর যদি তা না চান, মামলা ডিসমিস। বুঝলেন।
: মামলা ডিসমিস করার দরকার নেই। আমি এই মাসেই আসব।
: ভালো কথা, চাবি নিয়ে যান। আমি সপ্তাহে একদিন এসে বাড়ি দেখে যাব। বাড়ি হচ্ছে নিজে সন্তানের মতো। দেখাশোনা না করতে পারলে ভালো লাগে না। আপনার স্ত্রীকে বলে দেবেন।
: কী বলে দেব?
: এই যে সপ্তাহে সপ্তাহে আসব এইটা আর কি।
: জি বলে দেব।
: উঠবেন কবে?
: দুই-একদিনের মধ্যে।

পুষ্প চৈত্র মাসে বাড়িতে উঠতে রাজি হল না। চৈত্র মাসে নাকি নতুন কোন কাজ শুরু করতে নেই। সে মাস শেষ হলে নতুন বাড়িতে উঠবে। এর মধ্যে অল্প অল্প করে গুছিয়ে রাখবে। নতুন বৎসরে সে গোছালো বাড়িতে গিয়ে উঠবে।

বাড়ি গোছানোর পর্ব শুরু হল। বেতের চেয়ার কেনা হল। জানালার নীল পর্দা। একটা ছোট পড়ার টেবিল। বুককেস। একটা চৌকি। ভেতরের বারান্দায় পাতা থাকবে। হঠাৎ আত্মীয়স্বজন এসে পড়লে থাকবে। পুষ্প তার নিজের টাকা ভেঙে রান্নাঘরের জন্য একটা মিটসেফ কিনল। প্লাস্টিকের লাল রঙের বালতি।

নতুন সংসার শুরু করার প্রচণ্ড আনন্দ আছে। পুষ্প ছোটখাটো একটা কিছু কেনে, আনন্দে চোখ ছলছল করতে থাকে। দোকানে গেলেই বেহিসাবি হয়ে যেত ইচ্ছে করে। কয়েকবার এরকম হয়েছেও। একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনেছে চিনামাটির লবণদানি। জিনিসটা এত সুন্দর যে এতে লবণ রাখতে মায়া লাগে। সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। প্রায়ই সে ভাবে তার যদি প্রচুর টাকা থাকত কী সুন্দর করেই না সে ঘর সাজাত। যে-ই দেখতো সে-ই মুগ্ধ হয়ে যেত। একদিন নিশ্চয়ই তার টাকা হবে। প্রচুর টাকা। তখন হয়তো ঘর সাজাতেই মন চাইবে না।

পুষ্প ছেলেকে কোলে নিয়ে নিশাতের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে কলিংবেল টিপল। সে আজ একটা বিশেষ কারণে এসেছে। পল্টুকে এখানে রেখে যাবে যাত্রাবাড়ীতে। তার নানিজানকে নিয়ে এসে তার নুতন সংসারের শুরুটা দেখাবে।

: কী ব্যাপার পুষ্প? বেশ ক'দিন পর তোমাকে দেখলাম।
: খুব ব্যস্ত আপা। আমাদের নতুন বাসাটা সাজাচ্ছি।
: কীরকম সাজাচ্ছ একদিন গিয়ে দেখে আসতে হয়।
: আপনি কি সত্যি যাবেন?



: হ্যাঁ যাব। তোমার জন্যে একটা ছবি আঁকছি। সেই ছবি তোমাদের বাসায় সুন্দর একটা জায়গায় টানিয়ে দিয়ে আসব।
: কী ছবি আপা? একটু দেখি?
: না, দেখা যাবে না।
: আপা, আপনি কি পল্টুকে একটু রাখবেন? ঘন্টা দু'একের জন্যে।
: ঘন্টা দু'একের জন্যে তো রাখতে পারবো না। কারণ এখন যাচ্ছি মা'র বাসায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখতে চাইলে রেখে যাও।
: তাহলে তো আপা আরও ভালো হয়।
: খুব সাজগোজ করেছ দেখছি! যাচ্ছ কোথায়?
: নানিজানের কাছে যাব। তারপর তাঁকে আমার নতুন বাসা দেখাতে নিয়ে আসব।
: চমৎকার!
: এই ব্যাগে ওর বাড়তি জামা আর প্যান্ট আছে।
: টেবিলের উপর রেখে দাও।
: আমি যাই আপা?
: যাও।

যেতে গিয়েও পুষ্প হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। চাপাগলায় বলল, আপনি এত ভালো কেন আপা বলুন তো? জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একটা ভুল হয়ে গেছে। রকিব কোন কারণে অফিস ফাঁকি দিয়ে যদি চলে আসে তাহলে ঘর বন্ধ দেখলে রেগে যাবে। একটা চিঠি লিখে দরজার সামনে টানিয়ে যেতে হবে। অবশ্য চিঠি দেখলেও সে রাগ করবে। তবে নির্বোধ বলে গাল দিতে পারবে না। সে বুদ্ধি করে চিঠি লিখে যাচ্ছে।

পুষ্প লিখল, আমি নানিজানকে দেখতে যাচ্ছি। চারটা বাজার আগেই চলে আসব। রাগ করবে না কিন্তু।

শেষ লাইনটা লেখা কি ঠিক হচ্ছে? অন্য কেউ যদি এসে পড়ে? লাইনটা কাটতে ইচ্ছা করছে না। আবার রাখতেও অস্বস্তি লাগছে।

: ভাবী আসব? অধমের নাম মিজান, যদি ভুলে গিয়ে থাকেন। মিজানুর রহমান।

পুষ্প মুখ তুলে ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হাসল।

: কোথাও বেরুচ্ছেন বুঝি? সাজসজ্জা দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।
: জি।
: সঙ্গে গাড়ি আছে, আসুন নামিয়ে দিই।
: গাড়ি লাগবে না। আমি কাছেই যাব। ঐ তো পাশের বাসা।
: আপনি কি আমাকে ভয় পান ভাবী?
: জি না। ভয় পাব কেন? চা করে আনি? চা খাবেন?
: আনুন। আপনার পুত্র কোথায়?
: ওকে পাশের বাসায় নিয়ে গেছে, এক্ষুণি দিয়ে যাবে।
: আই সি।

পুষ্প চা বানিয়ে নিয়ে এল। মিজান চেয়ারে বসে আছে। মুখের ভঙ্গি গম্ভীর। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট কিন্তু সিগারেট টানছে না। সে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল।

: আপনি কীজন্যে আমাকে ভয় পান?
: ছি, কী বলেন ভাই! ভয় পাব কেন?



sohell.kazi@gmail.com

: ভয় পান বলেই তো মিথ্যা কথাটা বললেন—ছেলে পাশের বাসায় আছে, এক্ষুণি দিয়ে যাবে। যাতে আমি বুঝতে পারি যে এখানে আমাকে ভদ্র হয়ে থাকতে হবে। বেচাল কিছু করা যাবে না।

পুষ্প ক্ষীণ গলায় বলল, আমি সত্যি কথাই বলছি ভাই। নিশাত আপা এক্ষুণি বাবুকে নিয়ে যাবে।

মিজান সিগারেট ফেলে দিয়ে চায়ের কাপে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, অন্ধকারে একটা সুন্দরী মেয়েও যেমন অসুন্দরী মেয়েও তেমন। পার্থক্যটা হচ্ছে আলোতে।

: আপনি এসব কী বলছেন!
: সত্যি কথাই বলছি। আপনার কি ধারণা সুন্দরী মেয়ে আমি এর আগে দেখিনি? আপনাকে প্রথম দেখলাম?
: ছি ছি ভাই। আমি যদি কোন কারণে আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি আমাকে মাফ করে দিন।
: আমাকে দেখলেই আপনি এমন একটা ভাব করেন যেন আমি আপনাকে রেপ করতে এসেছি।

পুষ্প কেঁদে ফেলল। সে কী বলবে বা কী করবে বুঝতে পারছে না। সিঁড়িতে শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিশাত আপা বাবুকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সে কি চিৎকার করে নিশাত আপাকে ডাকবে? এটা কি ঠিক হবে? এই লোকটি হয়তো ঠাট্টা করছে। এর অভ্যাস হচ্ছে ঠাট্টা করা। সবার সঙ্গেই ইনি ঠাট্টা করেন। রকিব কত বার বলেছে।

: পুষ্প!

পুষ্প চমকে উঠল। কী আশ্চর্য, নাম ধরে ডাকছে কেন? পুষ্প থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে কি ছুটে বেরিয়ে যাবে?

: নাম ধরে ডাকলাম বলে চমকে উঠলেন নাকি? চমকে ওঠার কিছু নেই। মানুষের নাম দেয়া হয় ডাকার জন্য। তা ছাড়া কেউ তো তা জানতে পারছে না। আমি যদি এখন আপনাকে আরও মধুর কোনো নামে ডাকি তাহলেও কিছু যায় আসে না।
: আপনার কী হয়েছে? আপনি এরকম কথা বলছেন কেন?
: আমার কিছুই হয়নি। আমি ভালো আছি। আপনি কাঁদছেন কেন?
: মিজান ভাই, আজ আপনি চলে যান। অন্য আরেকদিন আসবেন।
: এসেছি যখন একটু বসি। রোজ রোজ আসা তো মুশকিল। কই, আপনার বান্ধবী তো এখনও বাচ্চা নিয়ে এল না।

মিজান উঠে দাঁড়াল। হয়তো এবার চলে যাবে। শুধু শুধুই সে ভয় পাচ্ছিল। পুষ্প শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। মিজান দরজার সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল। একবার তাকাল পুষ্পের দিকে এবং খুব সহজ ভঙ্গিতে দরজার হুক তুলে দিল।

পুষ্প কাঁপা গলায় বলল, দরজা বন্ধ করছেন কেন?

: কেন বন্ধ করছি বুঝতে পারছ না?
: মিজান ভাই, আমি আপনার পায়ে পড়ি।
: তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। কেউ কিচ্ছু জানবে না। আমি তো কাউকে কিছু বলবই না। তুমিও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। লোকলজ্জা বড় কঠিন জিনিস।

পুষ্প চিৎকার করে উঠতে চাইল, মুখ দিয়ে স্বর বেরুল না। রান্নাঘরের দিকে ছুটে যেতে চাইল। ছুটে যেতে পারল না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন। এই লোকটি তার গায়ে হাত দিচ্ছে কেন? এ কে? আমি চিৎকার করতে চাই।



আমাকে চিৎকার করতে দাও। এই লোক আমাকে চিৎকার করতে দিচ্ছে না। মুখ চেপে ধরে আছে। আম্মা, আম্মা, আমাকে বাঁচান আম্মা। আমি মরে যাচ্ছি।

পুষ্প জ্ঞান হারাল। মিজান তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরাল। আয়নায় মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হচ্ছে না। সিগারেটটা ধীরেসুস্থে শেষ করা যেতে পারে।

আয়নায় পুষ্পকে দেখা যাচ্ছে। অচেতন অর্ধনগ্ন একটি রূপবতী তরুণী হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে। শঙ্খের মতো সাদা। বুক নিশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে।

অপূর্ব দৃশ্য। মিজান মুগ্ধ হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃশ্যটি সরাসরি দেখার চেয়ে আয়নায় দেখতে বেশি ভালো লাগছে।

মিজান সিগারেট ছুড়ে ফেলে শোবার ঘরের দরজা ভিড়িয়ে দিল যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না। পুষ্প অচেতন অবস্থাতেই বিড়বিড় করে তার মাকে ডাকছে।

৭

নিশাত বলল, ছটফট করছ কেন? চুপ করে থাকে। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনা।

: ক'টা বাজে?
: পাঁচটা পঁচিশ।
: ও আসছে না কেন?
: আসবে। অফিস ছুটি হয় পাঁচটায়, আসতে সময় লাগবে না!
: আপনি চলে যাবেন না তো?
: না, আমি আছি। আমি এক সেকেন্ডের জন্যেও এই ঘর থেকে যাব না।
: আপা আমি কাঁদতে পারছি না।
: তোমার কাঁদার দরকার নেই।
: আর কেউ জানে না তো?
: কেউ জানে না।
: আপনি কাউকে বলবেন না। আপনি কাউকে বললে আমি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ব।
: আমি কাউকে কিছু বলব না।

নিশাত উঠে এসে পুষ্পের গায়ে চাদর ভালো করে জড়িয়ে দিল। পল্টু চোখ বড় বড় করে মাকে দেখছে।

: আপা!
: বলো।
: পল্টু কি কিছু বুঝতে পারছে?
: কিছু বুঝতে পারছে না। তুমি একটু শুয়ে থাক।
: না। আপনি কিন্তু যাবেন না।
: বললাম তো আমি যাব না।
: ক'টা বাজে আপা?
: পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।
: আমার কেমন যেন গা-ঘিনঘিন করছে। আপা আমার বমি আসছে।
: বাথরুমে যাও। বমি করে আসে। এসো আমি নিয়ে যাচ্ছি।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

পুষ্প বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারল না, হড়হড় করে বমি করল। সেই বমির অনেকখানি এসে লাগল নিশাতের শাড়িতে।

: আপা আপনাকে নোংরা করে ফেলেছি।

: কোন অসুবিধা নেই। আমি পরিষ্কার করে নেব। তুমি যাও, হাত-মুখ ধুয়ে আসো।

: আমি আরেকবার গোসল করব আপা।

: তুমি একটু পরপর গোসল করছ। বড় একটা অসুখ বাধাবে।

: আমি এখন গোসল করতে না পারলে মরে যাব আপা।

পুষ্প বাথরুমের দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। শাওয়ার খুলে দিয়েছে। প্রচণ্ড তোড়ে পানি নেমে এসেছে। পানির নিচে মাথা দিয়ে পুষ্প বসে আছে। যেন সে মানুষ নয়। পাথরের কোন মূর্তি।

নিশাত দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে পল্টুকে কোলে করে তার নিজের ঘরে গেল। পুষ্প বাথরুম থেকে বেরুবার আগেই দ্রুত কয়েকটা টেলিফোন করা দরকার। প্রথমেই কথা বলা দরকার বাবার সঙ্গে। বাবা খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি দিতে পারবেন।

: হ্যালো বাবা!

: কে নিশু বেটি! কী হয়েছে রে মা?

: একটা ভয়ংকর ব্যাপার হয়েছে বাবা।

: বল, শুনি।

: তুমি কি এক্ষুণি আসতে পারবে?

: না পারব না। কোমরের ব্যথা শুরু হয়েছে। কী হয়েছে বল।

: আমার পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটির কথা তোমাকে বলেছি না? সেই মেয়েটি রেপড হয়েছে। পল্টুর মা। বাবা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

ফরহাদ সাহেব মেয়ের কথার জবাব দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

: বাবা!

: শুনছি মা।

: এখন আমি কী করব বলো। মেয়েটির স্বামী এখনও ফেরেনি।

: মেয়েটির শরীরের অবস্থা কেমন? হাসপাতালে নিতে হবে?

: না, তা হবে না। আমি কী করব? পুলিশে খবর দেব?

: তুমি কিচ্ছু করবে না। কাউকে খবর দেবে না। মেয়েটির স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করবে।

: পুলিশের কোন বড় অফিসারের সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে?

: হ্যাঁ আছে। কিন্তু মা, বি পেশেন্ট, মন দিয়ে আমার কথা শোনো। তুমি কিছু করবে না। মেয়েটির স্বামী আসুক।

: উনি তো এখনও আসছেন না।

: মা, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এটা তো তোমার কোন ব্যাপার না!

: একটা মেয়ে রেপড হয়েছে। আমি নিজেও একটা মেয়ে। আমার কাছে কেমন লাগছে তুমি বুঝতে পারছ না, মনে হচ্ছে পারবেও না।

: নিশু মা, একটা কথা শোনো ...

: আমি পরে কথা বলব।

নিশাত টেলিফোন নামিয়ে পুষ্পের ঘরে ছুটে গেল। পুষ্প এখন বাথরুমে। শাওয়ার থেকে প্রবল বেগে পানি ঝরছে।



: পুষ্প! পুষ্প! এই পুষ্প!

: জি।

: বেরিয়ে এসো।

পুষ্প জবাব দিল না।

: তুমি যদি এই মুহূর্তে বের না হও আমি কিন্তু চলে যাব।

পুষ্প শাওয়ার বন্ধ করে বের হয়ে এল। তার চোখ টকটকে লাল। শীতে সে কাঁপছে। ঠোঁট নীল হয়ে আছে। নিশ্চয়ই জ্বর এসেছে।

: ক'টা বাজে আপা?

: জানি না ক'টা বাজে। তুমি শুকনো কাপড় পরো। কম্বলটম্বল কিছু একটা গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ো।

: ঐ বিছানায় আমি কোনদিন শুতে পারব না।

: ঠিক আছে বিছানায় শুতে হবে না। চাদর পেতে দিচ্ছি।

: আপা, আপনার শাড়ি নোংরা হয়ে আছে।

: তোমাকে শুইয়ে রেখে আমি যাব, দুই-তিন মিনিট লাগবে।

: না আপা, আপনি যাবেন না।

: বেশ আমি যাব না।

মেঝের বিছানায় শোয়ামাত্র পুষ্প ঘুমিয়ে পড়ল। পল্টুও ঘুমাচ্ছে। নিশাত মা'র পাশে তাকে শুইয়ে নিজে ঘরে এসে কাপড় বদলালো। ঘরে টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে বাবার টেলিফোন।

জহির এখনও ফিরছে না। রাত আটটার আগে সে সাধারণত ফেরে না। আজ যদি সকাল-সকাল আসত! নিশাত ঘরে তালা লাগিয়ে বারান্দায় এসে দেখল পল্টুর বাবা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। তার এক হাতে বাজারের ব্যাগ অন্য হাতে দড়িতে বাঁধা কলা। নিশাতের চোখে চোখ পড়ামাত্র সে চোখ নামিয়ে নিল।

: রকিব সাহেব!

রকিব অবাক হয়ে তাকাল।

: আপনি একটু আমার ঘরে আসুন।

: আমাকে বলছেন?

: হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আসুন।

হাত গুটিয়ে রকিব বসে আছে। কলাগুলো তার কোলের উপর রাখা। সে ছোট ছোট করে নিশ্বাস ফেলছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে মাথা নিচু করে শুনছে। মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনকিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে সিগারেট বের করে আবার পকেটে রেখে দিল।

নিশাত বলল, আপনি সিগারেট খান, কোন অসুবিধা নেই।

: পল্টু, পল্টু কোথায়?

: আছে, ওর মার কাছেই আছে। আপনাকে শক্ত হতে হবে। বুঝতে পারছেন? এখন যান, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম ভাঙাবেন না। অপেক্ষা করবেন। আপনার স্ত্রীর মানসিক অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

রকিব জবাব দিল না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিশাত বলল, পুলিশে খবর দিতে হবে। আমি অনেক আগেই দিতাম। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।



sohell.kazi@gmail.com

: পুলিশ?

: হ্যাঁ পুলিশ, এত বড় একটা ঘটনার পরও আপনি পুলিশে খবর দেবেন না?

রকিব চুপ করে রইল। নিশাত বলল, আপনি আপনার বন্ধুকে শাস্তি দিতে চান না?

: চাই।

: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চান। কেন চাইবেন না?

: লোক জানাজানি হবে।

: তা তো হবেই। কিন্তু আজ যদি ঐ লোকটির শাস্তি না হয় তাহলে কী হবে ভেবে দেখুন। ও বুক ফুলিয়ে অন্য কোন মেয়ের কাছে যাবে। ঠিক একই অবস্থা হবে অন্য একটা মেয়ের।

: আমি একটু ভেবে দেখি।

: এর মধ্যে ভেবে দেখার কিছু আছে কি?

রকিব জবাব দিল না। নিশাত বলল, যান, আপনার স্ত্রীর কাছে যান। আমিও আসছি।

রকিব উঠে দাঁড়াল। সবগুলো কলা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। রকিব নিচু হয়ে কলাগুলো তুলছে। মনে হচ্ছে সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

: রকিব সাহেব, আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে যান। আমি একটু পরেই আসছি।

রকিব ঘর থেকে বের হতে আবার দরজায় ধাক্কা খেল। কলাগুলো আবার মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। টেলিফোন বাজছে। নিশাত ফোন ধরল।

: মা নিশু!

: হ্যাঁ বাবা।

: একটু পরপর টেলিফোন করছি কেউ ধরছে না।

: আমি ছিলাম না।

: মেয়েটির হাসব্যান্ড কি এসেছে?

: হ্যাঁ এসেছে।

: পুলিশ-কেস করতে চায়?

: কেন চাইবে না? চায়।

: এখন হয়তো ঝোঁকের মাথায় চাচ্ছে। তারপর যখন চারদিকে হৈচৈ শুরু হবে তখন মাথার চুল ছিঁড়বে।

: তখনকার কথা তখন হবে।

: আমাদের সোসাইটিকে তুমি চেন না মা।

: আমার চেনার দরকার নেই। বাবা, তুমি কি তোমার গাড়িটা পাঠাতে পারবে?

: পারব। গাড়ি দিয়ে কী হবে?

: থানায় যাব।

: নিশু মা, আমার একটা কথা শোনো।

: তুমি গাড়িটা পাঠাও তো বাবা!

নিশাত টেলিফোন নামিয়ে ঘড়ি দেখল। সাতটা পাঁচ বাজে। জহিরের আসতে এখনও অনেক দেরি।

সে তালা বন্ধ করে পাশের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ। বেশ কয়েকবার কলিংবেল টেপার পর রকিব দরজা খুলে দিল।

পুষ্প মেঝেতে মাথা নিচু করে বসে আছে। নিশাতকে ঢুকতে দেখেই বলল, ও পুলিশের কাছে যেতে চাচ্ছে না আপা। তুমি আমাকে নিয়ে চলো। ওরা তো টাকা নেবে,



তা-ই না? আমার কাছে টাকা আছে। আমার নানিজান আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন।

পুষ্প হুহু করে কেঁদে ফেলল। রকিব চেয়ারে বসে আছে। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

: আপা, ও আমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না আপা।

: তুমি যদি চাও আমি নিয়ে যাব। এক্ষুণি নিয়ে যাব। আর শুনুন ভাই, আপনি কেন নিতে চাচ্ছেন না?

রকিব জবাব দিল না। পল্টু জেগে উঠেছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে তার মাকে ধরতে গেল। পুষ্প বাঁহাতে এক ঝটকা দিয়ে তাকে ফেলে দিল। এই শিশু মা'র কাছ থেকে কখনো এরকম ব্যবহার পায়নি। সে এতই অবাক হল যে কাঁদতে পারল না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। অভিমানে তার ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে। চোখ ছলছল করছে।

৮

মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ তাকিয়ে আছেন। পুলিশরা কোন ব্যাপারেই কৌতূহলী হয় না। কৌতূহল ও বিস্ময় তাদের থাকে না। কিন্তু এই অফিসারটির গলায় খানিকটা আগ্রহ যেন আছে। তিনি নিশাতের চোখে চোখ রেখে বললেন, বলুন।

: আমি কি একটু নিরিবিলিতে বলতে পারি?

: থানা হচ্ছে একটা বাজার। মাছের বাজার। এর মধ্যে নিরিবিলি কোথায় পাবেন! যা বলতে চান এর মধ্যে বলতে হবে।

: এর মধ্যে আমি কিছু বলতে পারব না।

: বসুন দেখি কী করা যায়।

অফিসার ইনচার্জ অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অতিদ্রুত মোটা খাতায় কীসব লিখতে লাগল। এর মধ্যে টেলিফোন আসছে। রোগা একটা লোক প্রতিবারই দূর থেকে উঠে এসে টেলিফোন ধরছে, যদিও টেলিফোনের কাছেই অন্য একজন লোক বসে আছে। হাত বাড়ালেই সে টেলিফোন ধরতে পারে। ধরছে না। ঘর-জোড়া বিরাট টেবিল। রাজ্যের কাগজপত্র সেখানে। সেইসব কাগজপত্রের উপর প্লাস্টিকের বড় থালায় বানানো পান। দেয়ালে বড় একটা ঘড়ি। ঘড়িটা পনেরো মিনিট ফাস্ট। ঘরের এক কোণায় কোমরে দড়ি বাঁধা দাড়িওয়ালা দুজন লোক বসে আছে। এরা প্রচণ্ড মার খেয়েছে। একজনের ঠোঁট কাটা। কাটা ঠোঁট বেয়ে রক্ত পড়ছিল। সেই রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধেছে। লোকটি কিছুক্ষণ পরপর ও আল্লাগো বলে চেঁচিয়ে উঠে কাঁদছে। সেদিকে কেউ কোনরকম গুরুত্ব দিচ্ছে না।

নিশাত বলল, আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করব?

: হাতের কাজটা সেরে নিই। ওয়াসিম, রেকর্ডরুমটা খুলে দাও। যান, আপনারা ঐ রুমে গিয়ে বসুন। ওয়াসিম ওনারদের নিয়ে যাও। আমি দু'তিন মিনিটের মধ্যে চলে আসব।

সেই রেকর্ডরুমেও তারা পনেরো মিনিটের মতো বসে রইল। একটা ছেলে এসে দু'কাপ চা এবং প্লেটে করে পান নিয়ে গেল। এই ঘরটা বাথরুমের কাছে। বিকট গন্ধ আসছে। ছোট ঘর কিন্তু আলো খুব কড়া। দুশো পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ কড়কড় করে।

পুষ্প চুপচাপ বসে আছে। একটা কথাও বলছে না। নিশাত দু'একটা টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করছে। পুষ্প জবাব দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে একটু যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। খুব সম্ভবত তার জ্বর।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: শরীর খারাপ লাগছে?

: না।

: বসে থাকতে ভালো লাগছে না, তা-ই না?

পুষ্প জবাব দিল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বাইরে ঘন অন্ধকার, দেখার কিছু নেই। তবু পুষ্প মনে হয় অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে।

: আমি অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। কিছু মনে করবেন না। ইচ্ছা করে বসিয়ে রাখিনি। আপনারা মনে হচ্ছে কোন 'রেপ' কেস রিপোর্ট করতে এসেছেন। তা-ই না?

নিশাত বিস্মিত হয়ে বলল, হ্যাঁ।

: এগারো বছর পুলিশে চাকরি করছি, কিছু কিছু বুঝতে পারি। আমার নাম নুরুদ্দিন, পুলিশ ইন্সপেক্টর। পুরো ঘটনা বলুন। ঘটনাটা কখন ঘটল?

নিশাত তাকাল পুষ্পের দিকে। পুষ্প মাথা নিচু করে বসে রইল। নুরুদ্দিন বললেন, আপনি যা জানেন তা-ই বলুন। ওনার সঙ্গে আমি পরে কথা বলব।

নিশাত গুছিয়ে কিছু বলতে পারল না। তার বারবারই মনে হল অফিসারটি মন দিয়ে কিছু শুনছেন না। বারবার নড়াচড়া করছেন। কথার মাঝখানে দু'বার উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে থুথু ফেললেন। একবার নিশাতকে চমকে দিয়ে খুবই উঁচু গলায় ডাকলেন, ওয়াসিম, ওয়াসিম! ওয়াসিম নামের কেউ একজন এসে দাঁড়াল।

নিশাত কথা বন্ধ করে চুপ করে রইল। নুরুদ্দিন সাহেব বিরক্তমুখে বললেন, গাড়ি এসেছে?

: জি না স্যার। চাকা নাকি পাংচার হয়েছে।

: চাকা ঠিক করতে সারাদিন লাগে! যাও। দ্যাখো কী ব্যাপার। দশ মিনিটের ভেতর গাড়ি চাই। যাও যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ওয়াসিম চলে যেতেই নিশাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারপর কী হল বলুন।

: যা বলার বলে ফেলেছি। এর বেশি বলার কিছু নেই।

নুরুদ্দিন তাকালেন পুষ্পের দিকে। গম্ভীর গলায় বললেন, আপনার স্বামী আসেননি কেন? ওনার কি কেইস ফাইল করার ইচ্ছা নেই?

পুষ্প জবাব দিল না। সে এখনও জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

: আপনি কেইস করতে চান?

: হ্যাঁ।

: আপনি গোসল করেছেন, তা-ই না?

: হ্যাঁ।

: বেশ কয়েকবার, তা-ই না?

: হ্যাঁ।

: এইখানেই একটা সমস্যা করেছেন। মেডিকেল রিপোর্টে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে না।

নিশাত বলল, রিপোর্টে কিছু না পাওয়া গেলে কি কেইস হবে না?

: অবশ্যই হবে। তবে যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি আজ রাতেই ৩৭৬ ধারায় ভদ্রলোককে গ্রেফতার করব। এটা নন-বেইলেবল, কাজেই বেল হবে না। মিজান সাহেবের ঠিকানা জানা আছে?

পুষ্প বলল, না।

:আপানার স্বামী নিশ্চয়ই জানেন?



: হ্যাঁ।

: আমরা ওনার কাছ থেকে জেনে নেব। চলুন যাওয়া যাক।

: কোথায় যাব?

: মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ডাক্তারি পরীক্ষাটা হয়ে যাক। এই জাতীয় কেইসের শুরুটা খুব ঝামেলা। অনেকেই এসব ঝামেলার ভেতর দিয়ে যেতে চান না।

নিশাত বলল, কী ধরনের শাস্তি হতে পারে বলতে পারেন?

: পারি। প্রমাণ করতে পারলে কুড়ি বছরের সাজা হয়ে যাবে।

: প্রমাণ করা কি শক্ত?

: হ্যাঁ শক্ত। বেশ শক্ত। তবে ভিকটিমের মনের জোর যদি থাকে তাহলে পারা যায়।

পুষ্প বলল, আমি ডাক্তারি পরীক্ষা করাব না। আমি বাসায় চলে যাব।

নুরুদ্দিন ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেললেন। শান্ত গলায় বললেন, অসুবিধাটা কোথায়? মহিলা ডাক্তাররা আপনাকে পরীক্ষা করবেন।

: আমি বাসায় চলে যাব।

: দশ মিনিটের ব্যাপার।

: একবার তো বললাম—আমি বাসায় যাব।

: যদি আপনি মেডিকেল টেস্টটা করান তাহলে আমি এক ঘন্টার মধ্যে এই হারামজাদাকে ধরে হাজাতে ঢুকিয়ে দেব। আর যদি না করান সে রাতের বেলা আরামে ঘুমুবে। অন্য কোন মেয়ের কাছে যাবে। আমি নিজে খুব যে একজন অনেস্ট অফিসার এটা দাবি করব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই ভদ্র অপরাধীগুলোকে ধরতে চাই। তাদের চৌদ্দপুরুষের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে চাই। আপনারা যদি সাহায্য না করেন কীভাবে করব?

: আমি বাসায় যাব।

: নিশ্চয়ই যাবেন। মেডিকেল কলেজের ঝামেলাটা মিটিয়েই চলে যাবেন। আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলব।

পুষ্পের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। একটু পরপর সে ফুঁপিয়ে উঠছে।

নুরুদ্দিন বললেন, যে-ব্যাপারটা আজ আপনার জীবনে ঘটেছে আপনার মেয়ের জীবনেও এটা ঘটতে পারে। পারে না? চলুন রওনা হই।

পুষ্প উঠে দাঁড়াল।

নিশাত মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে যে ঘরটায় বসে অপেক্ষা করছে এটা সম্ভবত নার্সদের কমনরুম জাতীয় ঘর। নার্সরা আসছে যাচ্ছে। মোটামুটি একটা বাজারের মতো ব্যাপার। এরা কেউ নিশাতকে তেমন লক্ষ্য করছে না। তবে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা নরুদ্দিনকে দেখছে কৌতূহলী হয়ে। একজন জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার স্যার?

নুরুদ্দিন হাই তুলে বললেন, কোন ব্যাপার না। আপনাদের দেখতে এলাম। আপনারা ভালো আছেন?

পুলিশ অফিসারের এই ভঙ্গিটি নিশাতের বেশ পছন্দ হল। খুবই স্বাভাবিক আচরণ। যেন কিছুই হয়নি। ব্লাডপ্রেশার মাপার জন্যে একজন রোগীকে নিয়ে এসেছেন।

সারাটা পথ রেপ কেইস প্রসঙ্গে বা মিজান সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি, বরং প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কয়েকটা নেড়িকুত্তা জটলা পাকাচ্ছিল তাতে কী সমস্যা হল সেই গল্প শুরু করলেন। মন্ত্রী টেলিফোনে পুলিশের সাহায্য চাইলেন। পুলিশ বলল, নেড়িকুত্তা



sohell.kazi@gmail.com

তো স্যার আমাদের ব্যাপার না। এটা মিউনিসিপ্যালটির ব্যাপার। প্রতিমন্ত্রী রেগে আগুন। মিউনিসিপ্যালটি বুঝি না, আপনাদের অ্যাকশন নিতে বলেছি আপনারা অ্যাকশন নিন। প্রতি রাতে বাড়ির সামনে রাজ্যের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে, তাহলে আপনারা আছেন কী জন্যে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ফায়ার ওপেন করতে হলে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগে। আমরা তাহলে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলি?

প্রতিমন্ত্রী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, এই সামান্য ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট লাগবে?

: জি স্যার লাগবে। গুলি কোন সামান্য ব্যাপার না। এখন বাজে রাত তিনটা। আবাসিক এলাকায় গুলি চলবে। সবাই টেলিফোন করবে পত্রিকা অফিসে। পত্রিকার রিপোর্টারা আসবে আমার কাছে। আমি তাদের পাঠাব আপনার কাছে। সম্পাদকীয় লেখা হবে। প্রেসিডেন্ট তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি..।

: থামুন। আপনাকে কিছু করতে হবে না।

নিশাত বুঝতে পারছিল ভদ্রলোক এইসব বলছেন পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে। এটা নিশাতের কাছে চমৎকার লাগল। একজন সেনসিবল মানুষ।

এই যে এখন তারা দুজন মুখোমুখি বসে আছে ভদ্রলোক একটি কথাও বলছেন না, কারণ তাঁর কথা বলার প্রয়োজন নেই। কথা যারা বেশি বলে তারা কাজ তেমন করতে পারে না। এই অফিসারটি নিশ্চয়ই কাজের।

: নুরুদ্দিন সাহেব!

: বলুন।

: এই জাতীয় কেইস কি আপনাদের কাছে আসে?

: না। খুব কম আসে। লোকলজ্জার ভয়েই কেউ আসে না। যা আসে লোয়ার ক্লাস থেকে। রিকশাওয়ালা, মজুর এইরকম। লোকলজ্জার ভয় ওদের তেমন নেই। আমাদের যেমন আছে।

: তা হয়তো ঠিক।

: একেবারেই যে হয় না তা নয়। কিছু কিছু হয়। মাঝপথে সেইসবও নষ্ট হয়ে যায়। পত্রিকাওয়ালারা বড় ঝামেলা করে। নানারকম কিচ্ছা-কাহিনী ছাপে। ধর্ষণের খবরগুলো যেন একটা চাটনি। ছবিটবি বক্স করে ছেপে দেয়। কোন কোন খবরে ধর্ষণের বর্ণনাও থাকে। পড়লে মনে হবে পর্নোগ্রাফি। যিনি লিখেছেন তিনি লেখার সময় খুব মজা পেয়েছেন এটা বোঝা যায়। আপনার কখনো চোখে পড়েনি?

: এইসব খবর আমি পড়ি না।

: আমার পড়তে ইচ্ছা করে না কিন্তু পড়তে হয়। বাধ্য হয়ে পড়তে হয়।

: এত দেরি হচ্ছে কেন?

: একটু সময় লাগবে। নানা ফ্যাকড়া আছে। এরকমও হয়েছে ডাক্তার চমৎকার রিপোর্ট দিয়েছেন। রিপোর্টের ওপরই কনভিকশন হয়ে যাবে এমন অবস্থা, কিন্তু আমরা সেসব রিপোর্ট কাজে লাগাতে পারিনি।

: কেন?

: বাদীপক্ষ কেইস উইথড্র করে। আগাতে চায় না। এক্ষেত্রেও তা-ই হয়তো হবে। দেখলেন না স্বামী বেচারার কোন আগ্রহ নেই! এল না পর্যন্ত! আমি যখন যাব আমার সঙ্গে কথাও বলবে না।

পুষ্পকে আসতে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে বুড়োমতো একজন ডাক্তার। রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। নুরুদ্দিন রিপোর্টে চোখ বোলালেন। নিশাত বলল, কী আছে রিপোর্টে?



নুরুদ্দিন জবাব দিলেন না। রিপোর্টটা পকেটে রেখে দিলেন। ডাক্তার সাহেব নিশাতকে বললেন, আমি কিছু সিডেটিভ প্রেসক্রাইব করছি। সিডেটিভ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। প্রচণ্ড মানসিক চাপ গেছে। পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

নুরুদ্দিন বললেন, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার কিছু ইনফরমেশনও দরকার। ঐ সঙ্গে নিয়ে আসব।

গাড়িতে নিশাত আরেকবার বলল, রিপোর্টে কী পাওয়া গেছে? নুরুদ্দিন প্রশ্নের জবাব দিলেন না। অন্য একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর সম্ভবত এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করবার ইচ্ছা নেই। নিশাত আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

জহির এখনও ফেরেনি।

নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধব জুটিয়েছে। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব জুটে যায়। বাড়ি ফিরতে রাত হয়। তার চোখে-মুখে অপ্রস্তুত ভাব লেগে থাকে। লজ্জিত অনুতপ্ত মানুষের আচরণ দেখতে ভাল লাগে। নিশাতের মনে হল আজ তা-ই দেখবে।

সে রান্না চড়াল। সামান্য কিছু রান্না করবে, ভাত, দু'পিস মাছভাজা, ডাল। ভাগ্যিস জহির তার বাবার মতো ভোজবিলাসী হয়নি। হলে মুশকিল হত। রান্নাঘরে সময় দিতে তার সময় লাগে না।

রান্না শেষ করে নিশাত দ্বিতীয়বার স্নান করল। তবু নিজেকে ঠিক ফ্রেশ মনে হচ্ছে না। মনের কোথাও যেন খানিকটা কাদা লেগে আছে। এই কাদা কিছুতেই দূর হবে না তার প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে খেতে বসে গেল। রাত দশটার মতো বাজে। আর অপেক্ষা করার অর্থ হয় না। জহির নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরবে।

পুষ্প কিছু খেয়েছে কি না কে জানে! হয়তো খায়নি। খোঁজ নেয়া উচিত। কিন্তু প্রচণ্ড আলসেমিতে শরীর কেমন করছে। মনে হচ্ছে কোনমতে বিছানায় গড়িয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যাবে। তা ছাড়া এরা স্বামী-স্ত্রী এখন কিছু সময় একা থাকুক। এর প্রয়োজন আছে।

ভাত শেষ না করেই নিশাত উঠে পড়ল। খিদে আছে কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না। অদ্ভুত শারীরিক অবস্থা!

জহির এল রাত এগারোটায়। মুখে অনুতপ্ত মানুষের লাজুক হাসি। টাই খুলতে খুলতে বলল, মহিউদ্দিনের পাল্লায় পড়েছিলাম। জোর করে ঢাকা ক্লাবে নিয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল না। দু'পেগ হুইস্কি খেতে হল। যত বলি শিকার আমার পছন্দ না, তত জোর করে। সব মাতালরা অন্যদের মাতাল বানানোর চেষ্টা করে। মনে করে এটা তাদের ডিউটি। ভাত খেয়েছে?

: হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয়ই খেয়ে এসেছ?

: হুঁ। কেমন বমি বমি লাগছে। হুইস্কি আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

: তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন কৈফিয়ত দিচ্ছ আমার কাছে। কৈফিয়ত দেবার কিছু নেই। খেতে ইচ্ছে করলে তুমি খাবে। মাতাল হতে চাইলে হবে। তোমার জীবন হচ্ছে তোমার, আমারটা আমার।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, তার মানে?

: মানে কিছু নেই।

: মনে হচ্ছে তুমি খুব রেগে গেছ?



www.banglabook.com

www.banglabook.com

না, আমি মোটেও রাগিনি। এর আগেও তুমি অনেকবার লিকার খেয়ে বাড়ি ফিরেছ। কখনো আমি কিছু বলিনি। বলেছি?

: তা বলনি কিন্তু মুখ অন্ধকার করেছ। মুখ অন্ধকার করার চেয়ে বলে ফেলা ভালো।

: আজও কি আমার মুখ অন্ধকার মনে হচ্ছে?

: হ্যাঁ।

: দুঃখিত। মুখ অন্ধকার করতে চাইনি। হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ো। তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না। বিশ্রাম নাও।

: জিনিসটা আমার সহ্য হয় না, মাতালের পাল্লায় পড়ে কড়া করে এক কাপ কফি করতে পারবে?

: হ্যাঁ পারব।

নিশাত রান্নাঘরে ঢুকল। কফি বানাল। টেবিলের উপর থেকে খাবারদাবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখল। জহির এসে উঁকি দিল রান্নাঘরে।

: নিশাত তোমার টেলিফোন। মোহাম্মদপুর থানা থেকে ইন্সপেক্টর নুরুদ্দিন তোমাকে চাচ্ছেন। ব্যাপার কী?

: ব্যাপার কিছু না।

: ব্যাপার কিছু না মানে? দুপুররাতে থানা থেকে তোমাকে টেলিফোন করবে কেন? হয়েছেটা কী?

: বললাম তো কিছু হয়নি।

নিশাত টেলিফোন ধরল। ইন্সপেক্টর নুরুদ্দিন বললেন, সরি, অনেক রাতে টেলিফোন করলাম।

: অসুবিধা নেই। আমি জেগেই ছিলাম।

: আমরা মিজানকে এই কিছুক্ষণ আগে গ্রেফতার করেছি এই খবরটা আপনাকে দিলাম। আপনি যদি ওনাকে খবরটা দেন উনি হয়তো খুশি হবেন।

: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!

: আরেকটা কথা, আপনি বারবার জানতে চাচ্ছিলেন যে মেডিকেল রিপোর্টে কিছু পাওয়া গেছে কি না। কিছু পাওয়া যায়নি।

: সেকী?

: এইসব ব্যাপারে সাধারণত ধস্তাধস্তি হয়। জখম থাকে ভিক্টিমের গায়ে। কামড়ের দাগ থাকে। সেসব কিছু নেই।

: ও অজ্ঞান ছিল?

: হ্যাঁ তা-ই। আমি বুঝতে পারছি। আমাদের এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে কোর্টকে বোঝাতে হবে। মুশকিল কী হচ্ছে জানেন, কোনো 'সিমেন'ও পাওয়া যায়নি।

: তা-ই নাকি?

: হ্যাঁ। তার কারণ বুঝতে পারছি। মেয়েটি নিশ্চয়ই বেশ কয়েকবার গোসল করেছে। এইসব ক্ষেত্রে মেয়েরা তা-ই করে। বিপদে পড়ি আমরা। চিহ্ন থাকে না।

: কেইস দাঁড়ান করাতে পারবেন না?

: আমার নাম নুরুদ্দিন। আমি খুব খারাপ লোক। আমি কেইস দাঁড়া করিয়ে দেয়। আপনারা খুব ভালো একজন লইয়ার দেবেন। আচ্ছা রাখি।

নিশাত টেলিফোন রেখে দিল। জহির তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে থমথমে গলায় বলল, কী হয়েছে?



: পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটি রেপড হয়েছে।

: তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? তোমাকে টেলিফোন করেছে কেন?

: আমি মেয়েটিকে পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়েছি।

: তুমি নিয়ে গেছ? কেন? তুমি কেন? তোমার কিসের মাথা ব্যথা?

নিশাত চুপ করে আছে। জবাব দিচ্ছে না। একবার ছোট্ট একটা হাই তুলল। জহির বলল, কথা বলছ না কেন?

: তুমি সুস্থ না। কাজেই কথা বলছি না।

: আমি সুস্থ না?

: না। তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না। যা মনে আসছে বলছ। এখন আমি তোমার কোন কথার জবাব দেব না।

নিশাত শোবার আয়োজন করছে। ঝাড়ন দিয়ে বিছানা ঝাড়ছে। মশারি গুঁজল। কড়া বাতি নিভিয়ে নীল বাতি জ্বালাল। যেন কিছুই হয়নি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার যেন কোন অস্তিত্ব নেই। নিশাত মশারির ভেতর থেকে বলল, এসো শুয়ে পড়ো। রাত কম হয়নি।

জহির হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ঘুমুতে এল। কোমল গলায় বলল, ঘুমিয়ে পড়েছ?

: না, চেষ্টা করছি।

: কিছু মনে করো না নিশাত। হঠাৎ মাথা এলোমেলো হয়ে গেল। আই অ্যাম সরি।

: আমি কিছু মনে করিনি।

জহির একটা হাত নিশাতের গায়ে তুলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিশ্বাস ভারি হয়ে এল। নিশাত খুব সাবধানে হাতটা সরিয়ে দিল। স্পর্শ সব সময় সুখকর হয় না। নিশাতের ঘুম আসছে না। অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে খুব একা লাগছে।

সে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে খুব তারা। ঝলমল করছে আকাশ। কত নক্ষত্র, কত ছায়াপথ। সীমাহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একজন মানুষের নিঃসঙ্গতাও কি সীমাহীন হয়?

৯

রকিব জেগে আছে। সে উবু হয়ে খাটের উপরে বসে আছে। তার পাশেই পল্টু। মেঝেতে সারাগায়ে চাদর জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুষ্প শুয়ে আছে। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার। পুষ্প ঘুমিয়ে আছে কি না রকিব বুঝতে পারছে না। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে। যেভাবে সারাগায়ে চাদর জড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে।

: পুষ্প! এই পুষ্প!

পুষ্প একটু নড়ল, কোন রকম শব্দ করল না। রাতে তাদের কারোরই খাওয়া হয়নি। রকিবের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে খাওয়ার কথা কী করে পুষ্পকে বলবে বুঝতে পারছে না। রাতে রান্না হয়নি। খাবারদাবার কিছু বাইরে থেকে আনিয়ে নেয়া উচিত ছিল। রাত জাগলেই খিদে পায়।

: পুষ্প! এই পুষ্প!

: কী?

: থানায় কী হল?



sohell.kazi@gmail.com

পুষ্প জবাব দিল না। চাদরে মুখ ঢেকে দিল। অত্যন্ত অবাক হয়ে রকিব লক্ষ্য করল এই মুহূর্তে তার শুধু খিদের কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে। অন্য কিছু মনে আসছে না। সে মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পুষ্পের মাথার কাছে চেয়ারটায় খানিকক্ষণ বসে রইল। ভোর হতে কত দেরি কে জানে! ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করছে না। তবে মনে হচ্ছে খুব দেরি নেই। ভোর হলে সে কী করবে? তার কী করা উচিত? এই বাড়িতে থাকা যাবে না। তার কেন জানি মনে হচ্ছে আশপাশের সবাই ব্যাপারটা জেনে গেছে। পুলিশ যাওয়া-আসা করেছে। জানাই তো উচিত। বাড়িওয়ালার ভাগ্নে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? সে শুকনো গলায় বলল, কিছু না।

: পুলিশ কী জন্যে?

: এই মামুলি ব্যাপার। কিছু জিনিসপত্র চুরি গেছে।

ছেলেটা এই কথা বিশ্বাস করল না। কীরকম অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল। সবই হচ্ছে কপালের খেলা। এত মেয়ে থাকতে সে কিনা বিয়ে করল পরীর মতো একটা মেয়েকে! কালো, নাক বোচা, বেঁটে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে কি আর এই সমস্যা হত? সুখে থাকত সে। মহাসুখে থাকত। কথায় আছে না পয়লা সুন্দরীর সঙ্গে করতে হয় ফষ্টিনষ্টি, দু'নম্বর সুন্দরীর সঙ্গে করতে হয় প্রেম। বিয়ে করতে হয় তিন নম্বর সুন্দরীকে।

সে করেছে বিরাট আহাম্মুকি। সুন্দরী বিয়ে করেছে। সুন্দর ধুয়ে এখন কি সে পানি খাবে? দেখতে সুন্দর হলেই হল না, বুদ্ধিও থাকতে হয়। বুদ্ধি থাকলে কখনো এই কাণ্ড ঘটে? একটা চিৎকার দিলে পঞ্চাশটা মানুষ আসে। সাহায্যের জন্যে আসে না। মজা দেখার জন্য আসে। তাতে তো অসুবিধার কিছু নেই। লোক তো জড়ো হয়।

এই কেলেঙ্কারির কথা নিশ্চয়ই পত্রিকায় উঠবে। পত্রিকাওয়ালারা এইসব জিনিসই খোঁজে। বক্স করে ছাপায়। এই খবরগুলো লোকজন পড়েও আগে। কালকের খবরের কাগজ খুললেই হয়তো দেখা যাবে— গৃহবধূ পুষ্প ধর্ষিতা। আত্মীয়স্বজনেরা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে কে জানে! জনেজনে চিঠি লিখতে হবে—'বাদ সমাচার এই যে খবরের কাগজে যে সংবাদ ছাপা হইয়াছে ইহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। নাম ও জায়গা এক হওয়ায় কিছুটা বিভ্রাট সৃষ্টি হইয়াছে। আমি পড়িয়াছি যন্ত্রণায়। জনে জনে পত্রপাঠ উত্তর দিবেন। শ্রেণীমতো ছালাম ও দোয়া দিবেন। আরজ ইতি।'

কিছুতেই ব্যাপারটা জানাজানি করতে দেয়া যাবে না। কেইসের তো প্রশ্নই আসে না। পুষ্পকে বুঝিয়ে বলতে হবে। মাথা-খারাপ করলে তো চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

রকিব শেষ সিগারেটটা ধরাল। পল্টু জেগে উঠেছে। রাতে একবার উঠে দুধ খায়। এটা কি সেই ওঠা কি না কে জানে! পল্টু কাঁদতে শুরু করেছে। পুষ্প নড়ছে না। যেন পল্টুর কান্নার শব্দ তার কানে যাচ্ছে না।

রকিব বলল, এই পুষ্প, ওকে দ্যাখো না, একটু দুধটুধ খাবে বোধহয়।

পুষ্প উঠল কিন্তু তার বাবুর কাছে গেল না। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাউমাউ শব্দে কাঁদতে শুরু করল। শব্দ যাতে বাইরে না আসে তার জন্যে দরজা বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু শব্দ আসছে। রকিব স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এই প্রথমবারের মতো মনে হল, পুষ্পকে কিছু সান্ত্বনার কথা বলার দরকার ছিল। সে বলেনি।

রকিব বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, এই পুষ্প কী করছ? দরজা খোলো।

পুষ্প দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সহজ ভঙ্গিতে বাবুকে কোলে নিয়ে দুধ খেতে দিল। ছেলেটা এত বড় হয়েছে এখনও মা'র দুধ খায়।



রকিব নিচু গলায় বলল, কান্নাকাটি করে এখন আর কী হবে! মানে...সে তার কথা শেষ করল না। কারণ, কী বলবে বুঝতে পারল না।

পুষ্প থেমে থেমে বলল, তুমি কি এখন আমাকে ঘেন্না করছ?

: ঘেন্না করব কেন?

: শরীরটা নোংরা হয়ে আছে এই জন্যে।

: কী যে বল!

: তুমি আমাকে ঘেন্না করছ। আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। এইসব বোঝা যায়।

বাথরুমের আলোর খানিকটা এসে পড়েছে পুষ্পের গায়ে। কী অদ্ভুত সুন্দরই-না তাকে লাগছে! রকিব এগিয়ে এসে পুষ্পের পিঠে হাত রাখল।

পুষ্প শান্তস্বরে বলল, আমাদের বাসার পাশে একজন মোক্তার সাহেব থাকতেন। কতগুলি গুণ্ডা ছেলে তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে এক রাত একটা দোকানে আটকে রেখেছিল। তাঁর স্ত্রী পরদিন ফিরে এসেছিলেন কিন্তু মোক্তার সাহেব তাঁর স্ত্রীকে ঘরে নেননি। পরের বছর তিনি আরেকটা বিয়ে করেছিলেন।

রকিব বলল, আজেবাজে কথা বলার কোন দরকার নেই। আসো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি। ভোরবেলায় আমরা এইখানে তালা দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব। কল্যাণপুরে তোমার ভাইয়ের বাসায় কিংবা অন্য কোথাও।

: কেন? কল্যাণপুরে যাব কেন?

: এইখানে জানাজানি হয়ে গেছে। নানা জনে নানা কথা বলবে।

: বলুক। আর জানাজানি তো হবেই। কোর্টে কেইস উঠবে না? তুমি কী ভাবছিলে? আমি মুখ বন্ধ করে বসে থাকব?

রকিব অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, এই পুষ্প দিনের বেলায় ভেঙ্গে-পড়া পুষ্প নয়। অন্য পুষ্প। তাকে সে ঠিক চেনে না।

১০

নিশাত খুব ভোরবেলায় তার মা'র বাড়িতে চলে এল। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাবাকে ধরা।

ফরহাদ সাহেব সকাল আটটার আগেই বাড়ি থেকে বের হন। রিটায়ার করার পর বিদেশী এক কোম্পানিতে কনসালটেন্সি করেন। ওদের অফিস শুরু হয় আটটায়।

গেট খুলে নিশাত অবাক হয়ে গেল। বারান্দায় তার বোন মীরু। ছ'বছর পর দেখা। এরা থাকে নিউজার্সিতে। দেশে যে বেড়াতে আসবে এরকম কোনো আভাস চিঠিপত্রে ছিল না।

নিশাত ছুটে এসে মীরুকে জড়িয়ে ধরল। মীরু বলল, দম বন্ধ করে মারবি নাকি? ছাড় তো!

: না, ছাড়ব না।

নিশাত আনন্দে কেঁদে ফেলল। মীরু হাসতে হাসতে উঁচুগলায় বলল, এই, তোমরা সবাই এসে দেখে যাও নিশাত কেমন ভ্যা ভ্যা করে কাঁদছে। এই মেয়েটা দেখি আর বড় হল না! মীরুর নিজের চোখও ভিজে গেল। কতদিন পর দেখছে নিশাতকে! খুব শখ ছিল এদের বিয়ের সময় থাকবে। আসা হয়নি।

মীরুর স্বামী ইয়াকুব বেরিয়ে এসেছে। সে হাসিমুখে বলল, নিশাত, এবার তোমার দুলাভাইকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ কাঁদো। তাকেও তো তুমি অনেকদিন পর দেখছ?

: আপনারা কখন এসেছেন দুলাভাই?



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছলাম রাত দুটায়। বেরুতে বেরুতে সাড়ে তিন। সারপ্রাইজ দেবার জন্যে কাউকে কোন খবর দেয়া হয়নি। কাজেই এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসার কোন ট্রান্সপোর্ট নেই। মহাযন্ত্রণা! তোমরা দু'বোন পরস্পরের দুঃখের আলাপ কিছু করে নাও। তারপর আমি কথা বলব। এক কাজ করো, একটা ঘরে ঢুকে যাও। বাইরে থেকে আমি দরজা বন্ধ করে দি।

নিশাত বলল, বাচ্চারা কোথায়?

: ওদের আনিনি। স্কুল খোলা। বাংলাদেশের স্কুল তো না যে অ্যাবসেন্ট করা যাবে।

: ক'দিন থাকবে?

: শুনে শুনে দশদিন। আজকের দিন চলে গেলে থাকবে ন'দিন। কাজেই তুই তোর বরকে নিয়ে চলে আয়। এই দশদিন একসঙ্গে থাকব। তোর বরটা কেমন?

: ভালো।

: শুকনো মুখে ভালো বলছিস কেন, জোর করে বল। মা বলছিলেন—একটু নাকি গম্ভীর টাইপের অমিশুক। শ্বশুরবাড়িতে বিশেষ আসেটাসে না।

নিশাত জবাব দিল না। তার একটু মন খারাপ হল। মা জহিরকে তেমন পছন্দ করেন না। করতেই যে হবে তেমন কথা নেই । কিন্তু যার সঙ্গে দেখা হয় তার সঙ্গেই প্রথমে নিজের অপছন্দের কথাটা বলেন। মীরু আপাকে আসতে না আসতেই বলেছেন। দু-একটা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না।

: নিশাত, তোর বরকে ইয়াকুবের সঙ্গে জুড়ে দেব, দেখবি সাতদিনে তাকে সামাজিক বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

: সব জামাই কি আর একরকম হয় আপা! মা'র বড় দুলাভাইকে মনে ধরেছে, আর কাউকে তার পছন্দ হবে না।

: তোর নিজের কি তোর বরকে পছন্দ হয়েছে?

: হ্যাঁ হয়েছে।

: গুড! আর কারও পছন্দ হোক না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। দাঁড়া, তোর দুলাভাইকে পাঠিয়ে দিই, জহিরকে নিয়ে আসবে।

: কাউকে পাঠাতে হবে না। খবর দিলে নিজেই চলে আসবে।

: না, ও গিয়ে নিয়ে আসবে। তোর জন্যে চমৎকার গিফট এনেছি। তোর দুলাভাই পছন্দ করে কিনেছে। বিয়ে উপলক্ষে গিফট। আন্দাজ কর তো কী?

: আন্দাজ করতে পারছি না।

: দাঁড়া এখানে, আমি নিয়ে আসছি। তার আগে আমার গালে একটা চুমু খা তো!

নিশাত মীরুর গালে চুমু খেল। আবার তার চোখে পানি এসে গেল। মীরু বলল, তোর পাশের ফ্ল্যাটের একটা মেয়ে নাকি রেপড হয়েছে? তুই খুব ছোটাছুটি করছিস?

: কে বলেছে?

: না, মা'র কাছে শুনলাম। তুই সাবধানে থাকবি। কেমন ফ্ল্যাট তোদের? ভালো প্রিকশন নেই। ঐ ফ্ল্যাট তুই ছেড়ে দে। অসম্ভব, ওখানে তোকে যেতেই দেব না!

নিশাত মুগ্ধ হয়ে মীরুকে দেখছে। কেমন হড়বড় করে কথা বলছে। কী সুন্দর লাগছে আপাকে! গিফট দেখাবার কথা বলেছে এখন আর তা তার মনে নেই।

নিশাত রান্নাঘরে উঁকি দিল। মা খুব ব্যস্ত। রাজ্যের রান্না মনে হচ্ছে একদিনে রেঁধে ফেলবেন। তাঁর মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। তিনি একবার শুধু নিশাতের দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

: এত আয়োজন কি শুধু সকালের নাশতার মা?

: হ্যাঁ, তুই জহিরকে আনবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দে।

: গাড়ি পাঠাতে হবে না, আমি টেলিফোন করছি চলে আসবে।



নিশাত তার বাবার খোঁজে গেল। তাঁকে পাওয়া গেল না। তিনি কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। নিশাত জহিরকে টেলিফোন করল।

: হ্যালো, তুমি এখানে চলে এসো।

: কেন বলো তো!

: আপা আর দুলাভাই এসেছেন আমেরিকা থেকে।

: তা-ই নাকি?

: হ্যাঁ, সারপ্রাইজড ভিজিট। তুমি চলে এসো। অফিসে যেতে হলে এখান থেকে যাবে।

: আসছি। নিশাত শোনো, ঐ মেয়েটি, মানে পুষ্প বেশ কয়েকবার এসে তোমার খোঁজ করে গেছে।

: কিছু বলেছে?

: না, বলেনি।

: তুমি কি আসবার সময় জিজ্ঞেস করে আসবে কী ব্যাপার?

জহির কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ইনভলবড হয়েছ এই যথেষ্ট। পুরো পরিবারসুদ্ধ ইনভলবড হবার কোনো কারণ দেখি না।

: ইনভলবড হবার তো কথা হচ্ছে না। তুমি শুধু জিজ্ঞেস করবে কী ব্যাপার।

: এর মধ্যে যদি এখানে আসে তাহলে জিজ্ঞেস করব। আমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারব না।

: আচ্ছা তা-ই করো।

১১

রকিব তিনদিন পর আজ প্রথম তার অফিসে এসেছে। চুপচাপ তার চেয়ারে বসে আছে। টেবিলের ফাইলপত্র খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিল। তার মনে হচ্ছে সবাই তাকে অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখছে। এখন পর্যন্ত কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেনি গত তিনদিন সে আসেনি কেন। অথচ এটা জিজ্ঞেস করা খুবই স্বাভাবিক।

পাশের টেবিলে বসে আজিজ খাঁ। তার বিশেষ বন্ধু। সেও এখন পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞেস করছে না। রকিব নিজে থেকেই বলল, জ্বরে পড়ে গিয়েছিলাম। গোসল করে ফ্যানের নিচে শুয়েছি ফট করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। সকালেও জ্বর ছিল।

আজিজ খাঁ তবু কিছু বলল না। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অথচ তার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কোন কারণ নেই। তার সমস্যার কথা এরা নিশ্চয়ই কিছু জানে না। কোন পত্রিকায় কিছু ছাপা হয়নি। সবকটা পত্রিকা সে খুঁটিয়ে খুটিয়ে পড়েছে। তাহলে সবাই এরকম করছে কেন? নাকি সবাই তার মনের ভুল?

টিফিনের সময় এজিএম মনসুরউদ্দিন সাহেব তাকে ডেকে পাঠালেন। মনসুরউদ্দিন সাহেব ধমক না দিয়ে অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন না এবং কাউকে বসতে বলেন না। কেউ যদি বসে পড়ে তিনি সরু চোখে তাকান। অথচ আজ তিনি রকিবকে ঘরে ঢোকামাত্র বসতে বললেন।

: রকিব সাহেব চা খাবেন?

: জি না স্যার।

: কাল তিনটার দিকে আপনাকে একবার খোঁজ করেছিলাম।



sohell.kazi@gmail.com

: কাল আসি নাই স্যার। জ্বর ছিল। গোসল করে ফ্যানের নিচে শুয়েছিলাম, বুকে ঠাণ্ডা বসে গেছে।

: ও আচ্ছা!

: কী ব্যাপার স্যার?

: না, মানে অফিসিয়াল কিছু না। এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আপনার খোঁজে।

আমার পরিচিতি আর কি! ওনার কাছে শুনলাম।

রকিবের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

: রকিব সাহেব, আপনি কি কোনো পুলিশ কেইস করেছেন নাকি?

রকিব হ্যাঁ না কিছু বলল না।

: ভদ্রলোক ঐ ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছিলেন। মানে কোন সেটেলমেন্টে আসা যায় কি না। অবিশ্যি আপনি ভালো বুঝবেন। আগে বলুন তো হয়েছেটা কী?

: কিছু হয়নি স্যার।

: ঐ ভদ্রলোকও তা-ই বলছিলেন। আমি ওনাকে আপনার বাসার ঠিকানা দিয়েছি। উনি ঠিক বাসায় যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী নন।

: উনি কে স্যার?

: মিজান সাহেবের মামা হন সম্পর্কে। চৌধুরী খালেকুজ্জামান। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আপনি বরং টেলিফোনে ওনার সাথে কথা বলেন। আমার কাছে একটা কার্ড আছে এই নিন।

রকিব হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিল। মনসুরউদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, এই জন্যেই ডেকেছিলাম। অন্য কিছু না। আপনি খালেকুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলুন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কোনরকম সংকোচ ছাড়া কথা বলবেন। খোলাখুলি কথা হওয়া ভালো। কী বলেন?

: জি স্যার।

: আমি বরং ওনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিই। আজ সন্ধ্যাবেলা বাসায় চলে যান। ব্যস্ত মানুষ তো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা হওয়া মুশকিল। তাহলে কি করব অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

রকিব এমনভাবে মাথা নাড়াল যার মানে হ্যাঁ বা না দুইই হতে পারে। সে অফিসে চারটা পর্যন্ত বসে রইল। বিভিন্ন ফাইল খুলল এবং বন্ধ করল। চারটার পর সে বাসায় গেল না। পার্কের বেঞ্চিতে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত বসে রইল। পার্কের কাছেই খালেকুজ্জামান সাহেবের বাসা। হেঁটে হেঁটেই যাওয়া যায়। রকিবের একবার মনে হচ্ছে তার যাওয়া উচিত। ভদ্রলোক কি বলেন শোনা উচিত। আবার পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে—কেন সে যাবে? তার কিসের গরজ?

রাত আটটা পর্যন্ত সে পার্কে বসে রইল। আটটার পর খালেকুজ্জামান সাহেবের বাসার সামনে উপস্থিত হল। বিশাল বাড়ি। গেট বন্ধ। খাকি পোশাক পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। রকিব নিচুগলায় বলল, চৌধুরী সাহেব কি বাড়ি আছেন?

: জি আছেন। দেখা করবেন?

: না, দেখা করব না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

দারোয়ানের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে রকিব লম্বা লম্বা পা ফেলে বাসার দিকে রওনা হল। রাস্তায় বাতি নেই। হাঁটতে কেমন গা-ছমছম করে। লোকজনের চলাচলও খুব কম। ঢাকা শহর বদলে যাচ্ছে। রাত ন'টার পর রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।



আকাশে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি নামলে খুব ঝামেলায় পড়তে হবে। ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরা। ঠাণ্ডা লেগে গেলে সর্বনাশ!

বড় রাস্তায় ওঠার আগেই বৃষ্টির ফোঁটা দু'একটা উপরে পড়তে শুরু করল। কিছু রিকশা আছে তারা কোথাও যাবে না। যাবে না তো রিকশা নিয়ে বসে আছে কেন কে জানে! রকিব চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসল। বৃষ্টি চেপে নেমেছে। ধরার কোন লক্ষণ নেই। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে কাকতেজা হয়ে। তার কপালটাই খারাপ। অফিস থেকে সরাসরি বাসায় চলে এলে এই ঝামেলা হত না।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রকিবের এগারোটা বেজে গেল। বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়েছে। গলা বসে গেছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে প্রবল জ্বর আসছে। ঠাণ্ডা তার সহ্য হয় না। তার জীবনটা এমন কেন? যেসব সহ্য হয় না বারবার সেসবের মধ্যে দিয়েই তাকে যেতে হয়।

সে না হয়ে অন্য কেউ হলে একটা রিকশা পেয়ে যেত। সে বলেই গেল না। হেঁটে কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে এতটা পথ আসতে হল।

বাসা ঘন অন্ধকারে ডুবে আছে। পুরো অঞ্চলে ইলেকট্রিসিটি নেই। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পুষ্প বসে আছে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে। কেন জানি মনে হচ্ছিল মিজান ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পেয়েই চলে এসেছে এখানে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে হাসিহাসি গলায় বলল— ভাবী চিনতে পারছেন তো? আমের নাম মিজান। রকিব যখন দরজায় ধাক্কা দিল, উঁচুগলায় বলল, দরজা খোলো, তখনও তার পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি এটা রকিব। পুষ্প ভয়কাতর গলায় বলেছে, কে, কে? পল্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল। পল্টুকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল, যেন এই শিশুটিও মায়ের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে।

: দরজা খোলা-না! এই পুষ্প!

পুষ্প দরজা খুলল। কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, কোথায় ছিলে তুমি? ইস কী অবস্থা হয়েছে! এরকম করে ভিজলে কেন?

রকিব জবাব দিল না। বাথরুমে ঢুকে গেল। পুষ্প বলল, ভয়ে আমি মরে যাচ্ছিলাম। নিশাত আপারাও নেই সন্ধ্যা থেকে। বাসায় ইলেকট্রিসিটি নেই। তুমি কথা বলছ না কেন? ভাত গরম করব?

রকিব সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

: এ্যাই , কথা বলছ না কেন?

: ভালো লাগছে না তাই বলছি না। এসেই প্রেমালাপ শুরু করব নাকি? অবস্থাটা দেখছ না।

: ভাত বাড়ব?

: না, পানি গরম করো। গার্গল করব।

পুষ্প গরম পানি এনে দিল। একটামাত্র মোমবাতি, তাও শেষের দিকে চলে এসেছে। শেষ হলেই অন্ধকারে ঘর ঢেকে যাবে। প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। শক্ত বাতাসও দিচ্ছে। আজ সারারাত নিশ্চয়ই কারেন্ট আসবে না।

: আজ সকালবেলা নিশাত আপা এসেছিলেন। ওনার বোন আর দুলাভাই এসেছেন এই জন্যে তারা ক'দিন ঐ বাড়িতে থাকবেন। কীরকম ভয়ের ব্যাপার না?

: ভয়ের কী আছে এর মধ্যে?

: এত বড় বাড়িতে আমরা একা। বাড়িওয়ালা তো নেই। শুধু তার ভাগ্নেটা আছে। ওকে দিয়েই মোমবাতি আনালাম।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: ভালো করেছ।

গার্গল শেষ হতে মোমবাতি ফুরিয়ে গেল। রকিব বিরক্ত মুখে বলল, আর নাই মোমবাতি?

: না।

একেকটা কাজ যা কর না! দুটো মোম আনতে কী অসুবিধা ছিল?

পুষ্প ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। এখন চুপ করে থাকাই ভালো। রকিব কোন কারণে রেগে আছে। অফিসে কিছু হয়েছে বোধহয়। অফিসে কিছু হলেই সে কয়েকদিন রেগে থাকে। কথা বললেই রেগে যায়।

পুষ্প ভাত খেল না। অন্ধকারে খাবে কীভাবে? সে অনেকদিন পর রকিবের পাশে নিজের বালিশ রাখল। এই ক'দিন তাদের দুজনের মাঝখানে বাবু ঘুমিয়েছে।

: নিশাত আপা বাবুর জন্যে খুব দামি একটা প্যান্ট আর শার্ট এনেছেন। দেখবে?

: অন্ধকারে দেখব কীভাবে? আমি কি বিড়াল নাকি?

পুষ্প লক্ষ্য করল রকিবের গলা তরল হয়ে আসছে। সেই রাগীরাগী ভাবটা এখন নেই।

: তোমার গলার ব্যথ্যাটা কমেছে?

: না, এই ঘোড়ার ডিম আর কমবে না।

: মাথা টিপে দেব?

: ব্যথা করছে গলা, মাথা টিপে দিলে কী হবে?

পুষ্প হেসে ফেলল। এই তো মানুষটা সহজ হয়ে গেছে।

: চা করে দেব? চা খাবে টোস্ট বিসকিট দিয়ে? রাতে কিছু খেলে না তো! খিদে লাগছে না?

: লাগছে।

: দেব করে?

: দাও বরং চারটা ভাতই দাও। অন্ধকারে খাব কী করে?

পুষ্প উঠে বসল। একটা হাত রাখল রকিবের গায়ে। তার মনে কিছু কথা জমে আছে, বলবে বলবে করেও বলা হয়নি। এই অন্ধকারে বলে ফেললে কেমন হয়! আঁধার সেই কথাগুলি বলবার জন্যে বিশেষ একটা পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে।

: এই শোনো, একটা কথা বলি?

: বলো।

: ঐ ঘটনার পর থেকে তুমি একদিনও আমাকে আদর করনি। আচ্ছা আমাকে তোমার এখন ঘেন্না লাগে? না বলো, আমি মন-খারাপ করব না। এখন কি আর আমার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করে না?

: রোজই তো ঘুমাচ্ছি।

:এই ঘুমের কথা বলছি না। আমাকে তোমার এখন ঘেন্না লাগে?

: আরে কী যে বল! মন-মেজাজ ঠিক নেই। মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। এখন কি এসব ভালো লাগে! ইচ্ছা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে।

পুষ্প অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বৃষ্টির বেগ আগের মতোই আছে। ঢাকা শহর মনে হচ্ছে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পুষ্প অস্পষ্টভাবে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আজ আমাকে একটু আদর করবে?

: অসুখে-বিসুখের মধ্যে এইসব যন্ত্রণা ভালো লাগে?



বলেই রকিব স্ত্রীকে টেনে নিল। গভীর আনন্দে পুষ্পের চোখে পানি এসে গেছে। তার মনে হচ্ছে পাশের মানুষটি ছাড়া পুষ্প আর কাউকে চেনে না। আর কেউ তার নেই। এই মানুষটি একটি কড়া কথা বললে সে ছাদ থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে। এই মানুষটি.....পুষ্প আর ভাবতে পারছে না। জগৎসংসার দুলে উঠতে শুরু করেছে। কী অপূর্ব, কী রহস্যময় স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাবাসির এই গোপন সম্পর্ক।

: পুষ্প!

: উঁ?

: আমরা সুখেই আছি, তাই না?

: হ্যাঁ।

: আমার একটা কথা শুনবে পুষ্প?

: কী কথা?

: বলছি। কিন্তু বলো তুমি শুনবে।

: হ্যাঁ।

রকিব পুষ্পকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এল। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, তোমার ব্যাপারটা জানাজানি হোক এটা আমি চাই না পুষ্প। জানাজানি হলে কী হবে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখো।

: কী হবে?

: খবরের কাগজে উঠবে। সবাই কেমন করে আমাদের দিকে তাকাবে। পল্টু বড় হয়ে জানবে। আত্মীয়স্বজনরা কানাকানি করবে।

: লোকটার শাস্তি হোক তুমি চাও না?

: চাইব না কেন? অবশ্যই চাই। হারামজাদাকে আমি গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করাব।

পুষ্প হাসল। অন্ধকারে সেই হাসি রকিব দেখতে পেল না।

: তোমাকে কথা দিচ্ছি পুষ্প। প্রফেশন্যাল লোক লাগিয়ে কুত্তার বাচ্চাটার ভুঁড়ি নামিয়ে ফেলব।

পুষ্প শান্ত গলায় বলল, আমি কী চাই জান? আমি চাই সবাই শয়তানটাকে দেখুক। সবার সামনে শয়তানটার কঠিন শাস্তি হোক, তারপর আমরা কোন এক অচেনা জায়গায় চলে যাব। সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। কেউ কিছু জানবে না। আমরা নিজেরা নিজেরা থাকব।

: অচেনা জায়গায় চাকরিটা আমাকে দেবে কে?

: নিশাত আপা জোগাড় করে দেবেন। আমাকে বলেছেন। উনি সব ভেবে রেখেছেন। তিনি কী বলেছেন বলব?

রকিব জবাব দিল না। পুষ্প আগ্রহ নিয়ে বলতে লাগল, নিশাত আপা বলেছেন, তোমার জন্যে সিলেট চা-বাগানে একটা চাকরির ব্যবস্থা করবেন। নিশাত আপার শ্বশুর একটা চা-বাগানের মালিক। এখানে তুমি যা বেতন পাও সেখানেও তা-ই পাবে। কী, কথা বলছ না কেন?

: তোমার নিশাত আপার এত দরদ কেন?

: মানুষের জন্যে মানুষের দরদ থাকবে না? পৃথিবীর সব মানুষই কি তোমার বন্ধুর মতো?

: ঐসব হচ্ছে মুখের কথা। চা-বাগানের চাকরি জোগাড় করবে, চাকরি এত সোজা?

: নিশাত আপা করবে।



sohell.kazi@gmail.com

: আর করলেইবা সেই চাকরি আমি নেব কেন? দয়া-দেখানো চাকরি। ঐ সবের কোন ভবিষ্যৎ আছে?

: ভবিষ্যৎ নাইবা থাকল! নিরিবিলি একটা জায়গায় না হয় নতুন করে জীবন শুরু করলাম।

পুষ্প গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, রকিব কিছু বলছে না।

বৃষ্টির জোর কমে আসছে। জানালা গলে হিমশীতল বাতাস ঢুকছে। মশারি নৌকার পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে।

পল্টু জেগে উঠেছে। অন্ধকার দেখে কাঁদছে। পুষ্প কিছু বলছে না। যেন তার ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছে না।

## ১২

নিশাতের মনে হল আজ কোন কারণে জহির রেগে আছে। জহির খুব সহজে রাগ আড়াল করে রাখতে পারে। প্রচণ্ড রাগ নিয়েও সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে। বিয়ের প্রথম প্রথম ব্যাপারটা সে বুঝতে পারেনি। এখন পারে। চেহারা দেখে বলে দিতে পারে জহির রেগে আছে কি রেগে নেই।

এখন যেমন পারছে। তবে রাগের কোন কারণ নিশাত ধরতে পারছে না। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত তারাও বাড়িতে ছিল। জহির খুব আগ্রহের সঙ্গে দুলাভাইয়ের সঙ্গে গল্প করেছে। দুলাভাইয়ের অতি তুচ্ছ রসিকতাতেও খুব শব্দ করে হেসেছে। জহিরের জন্যে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। তবে বোঝা গেছে যে খুব আনন্দে আছে। আজ এই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কী হল? অফিসে কোন গণ্ডগোল হয়েছে? অফিসের গণ্ডগোলে বিচলিত হবার লোক তো জহির নয়!

নিশাত নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। স্বামীকে লক্ষ্য করতে লাগল দূর থেকে। জহির অফিসের কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় চা খেতে এল। এটা তার রুটিন। পরপর দু'কাপ চা নিঃশব্দে খাবে, কোনরকম কথা বলবে না। চোখের সামনে থাকবে খবরের কাগজ কিংবা কোনো গল্পের বই। আজ রুটিনের ব্যতিক্রম হল। জহির চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, বাবার একটা চিঠি পেলাম। আগামাথা কিছু বুঝতে পারছি না। নিশাত, তুমি একটু পড়ে দেখবে?

নিশাত বলল, যে চিঠির আগামাথা তুমি বোঝনি আমি কী করে বুঝব? আমার কি এত বুদ্ধি?

: বাবা লিখেছেন তুমি নাকি তাঁর কাছে একটা চাকরি চেয়েছ। চা-বাগানের চাকরি।

: আমার নিজের জন্যে না, অন্যের জন্যে।

: কার জন্যে জানতে পারি?

: পার। পুষ্পের স্বামীর জন্যে। ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে ও বেচারা থাকতে পারবে না। নিরিবিলি কোন জায়গায় তাদের চলে যেতে হবে।

জহির কথা বলছে না। চায়ের কাপেও চুমুক দিচ্ছে না। সে রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে কি না কে জানে!

নিশাত বলল, তোমার চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

জহির চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে কাপ সরিয়ে রাখল। নিচু গলায় বলল, তোমার কি মনে হয় না তুমি সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছ?

: না, তা মনে হয় না।



: আমার কিন্তু মনে হচ্ছে।

: মনে হলে কিছু করার নেই।

: ব্যাপারটা তুমি কি ভুলে যেতে পার না? অনেক কিছু তো করলে, আর কেন?

: আমি কিছুই করিনি। চিঠিটা পড়ে দেখি।

: আমার কোটের পকেটে আছে।

নিশাত উঠে চিঠির খোঁজে ভেতরে গেল। চিঠি নিয়ে এসে আবার বসল জহিরের সামনে। মানুষটা কী কঠিন দৃষ্টিতে তাকে দেখছে! সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে খাম খুলল।

নিশাত ভেবে পাচ্ছে না তার চিঠির উত্তরে উনি জহিরকে কেন লিখবেন? চাকরি কি দিতে পারবে না? এই কথা সরাসরি জানাতে সংকোচ করেছেন?

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে নিশাতের সম্পর্ক খুব ভালো নয়। ওদের সবাই যেন কেমন আলগা-আলগা। নিশাতের শ্বশুর ইসমাইল সাহেব দশ মিনিট কথনো কারও সঙ্গে কথা বলেন না। নিশাতের সঙ্গে কথাবার্তা 'হ্যাঁ হুঁ'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, নববর্ষ এইসব উপলক্ষে লোকমারফত একটা বড় প্যাকেট এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে ইংরেজিতে একটা নোট যার সারমর্ম—এই আনন্দ তোমার জীবনে অক্ষয় হোক।

জহিরের কাছের চিঠিটিও ইংরেজিতে লেখা। টাইপ করে পাঠিয়েছেন। এই চিঠির ও নিশ্চয়ই কয়েকটি কপি আছে, ফাইল কপি, অফিস কপি। নিশাত চিঠি পড়ল—

*প্রিয় জহির,*

নিশাত সম্প্রতি আমার কাছে চা-বাগানের একটি চাকরি চেয়ে চিঠি দিয়েছে। চাকরি কার জন্যে এবং সেই চাকরিপ্রার্থীর অভিজ্ঞতা কী তা লেখেনি। আমি নিজে যাচাই না করে কাউকে চাকরি দিই না। তবে নিশাতের জন্যে একটি ব্যতিক্রম ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তোমার স্ত্রীকে আমি খুব পছন্দ করি। তার অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখব। তোমাকে এই চিঠি লেখার কারণ হচ্ছে তুমি আমাকে চাকরিপ্রার্থী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেবে। সে যেন চা বাগানের চাকরি চেয়ে একটি দরখাস্ত করে। দরখাস্ত অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হতে হবে। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার পর আমি নিশাতকে চিঠি দেব।

ইতি

মোহাম্মদ ইসমাইল

কাজের চিঠি। 'তুমি কেমন আছ' জাতীয় একটি বাক্য পর্যন্ত নেই। যেন চিঠিটা কোন মানুষের লেখা নয়, যন্ত্রের লেখা। নিশাত তাকাল জহিরের দিকে। রাগের কঠিন ভঙ্গিগুলো এখন আর জহিরের চেহারায় নেই। সে নিজেকে সামলে ফেলেছে। এখন সে বেশ সহজ ভঙ্গিতে কথা বলবে যেন দুজনের মধ্যে কোন কিছু হয়নি।

জহির খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে হাসিমুখে বলল, চিঠি পড়লে?

: হ্যাঁ।

: পরে এই চিঠির ব্যাপারে নিয়ে আলাপ করব। এখন বলো তোমার প্রোগ্রাম কী?

: আমার প্রোগ্রাম দিয়ে কী করবে?

: তোমার দুলাভাই সবাইকে নিয়ে বড় কোন জায়গায় খেতে চান। নির্ভর করছে তোমার প্রোগ্রামের উপর। যা ব্যস্ত তুমি! আজ সন্ধ্যায় সময় হবে?

: হবে।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: ভালো। তোমার দুলাভাই মানুষটি খুব চমৎকার। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।
: আর আমার বোন?
: তিনি তোমার মতোই।
: আমার মতো বলতে কী মিন করছ? আমি মন্দ না ভালো।
: কখনো কখনো ভালো। কখনো মন্দ।
: উদাহরণ দাও। আমি কখন ভালো কখন মন্দ।
: কারও সাথে-পাঁচে থাক না। নিজের মতো জীবনযাপন কর। এটা খুব ভালো। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের জিনিস নিয়ে মাতামাতি কর, এটা মন্দ।
: পুষ্পের ব্যাপারটার কথা বলছ?
: হ্যাঁ।
: এই ঝামেলা এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কেইস। খুব দ্রুত হয়। পুলিশ আজকালের মধ্যে চার্জশিট দিয়ে দিবে। বাকি রইল শুধু একজন ভালো উকিল।
: পাওনি এখনও?
: পেয়েছি, আজ কথা হবে।
জহির মুখ নিচু করে হাসছে। নিশাত বলল, হাসছ কেন? হাসির কী বললাম?
: তোমার দুলাভাই বলছিলেন তোমার কিছু করবার নেই, তাই বাইরের যন্ত্রণা নিয়ে মাতামাতি করছ। তোমার দু'একটা ছেলেপুলে থাকলে এটা করতে না। আমাকে এই লাইনে কিছু সৎ পরামর্শ দিলেন।
: পরামর্শ তোমার মনে ধরেছে?
: হ্যাঁ, চলো একটা বাচ্চাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসি।
নিশাত বাইরের দিকে তাকাল। কী চমৎকার একটা কথা বলেছে—একটা বাচ্চাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসি। একমাত্র বাবা এবং মা এই দুজনে মিলেই অদৃশ্য, অচেনা রহস্যময় জগৎ থেকে একটা শিশুকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন।
: কী ব্যাপার নিশাত, এরকম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ কেন? তোমার মত নেই?
নিশাত কোমল স্বরে বলল, আমার হাত আছে।
বলেই তার কেমন যেন লজ্জা লাগল। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। লজ্জা ঢাকার জন্যে উঠে বারান্দায় চলে গেল। খুব ইচ্ছা করছে পুষ্পের বাচ্চাকে ধরে এনে কিছুক্ষণ আদর করতে। সময় নেই। উকিলের খোঁজে যেতে হবে। সরদার এ করিম। ক্রিমিন্যাল আইনের ওস্তাদ লোক। তার হাতে একবার ব্যাপারটা তুলে দিতে পারলে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়।
: নিশাত!
: কী?
: তোমার গোলাপের টবগুলোর অবস্থা দেখছ? সবগুলো গাছে পোকা ধরেছে। গত সপ্তাহে তুমি ইনসেকটিসাইড দাওনি, তাই না?
: ভুলে গিয়েছিলাম।
: তাই দেখছি। জগৎসংসার ভুলে যেতে বসেছ। কয়েকদিন পর দেখা যাবে আমার কথাও তোমার মনে নেই।
নিশাত কিছু বলল না। গোলাপ গাছগুলোর অবস্থা সত্যিই কাহিল। পানিও দেয়া হয় না। টব শুকিয়ে খটখট করছে। সত্যি খুব অন্যায় হয়েছ। তৃষ্ণায় এদের বুকের ছাতি



ফেটে যাচ্ছিল। অথচ পানির কথা কাউকে বলতে পারে না। নিশাত গাছগুলোতে পানি দিল। ওষুধ স্প্রে করে দিল। এই ওষুধটা দেবার সময় কেন জানি তার গা কাঁপে। কঠিন বিষ। অথচ কী সুন্দর সোনালি রং। ইচ্ছা করে পরিষ্কার গ্লাসকে একটা গ্লাসে ঢেলে এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে দিতে।
: নিশাত!
: বলো।
: চলো রওনা হওয়া যাক।
: ডিনারের দাওয়াত, এত তাড়া কিসের!
: একটু সকাল-সকালই যাওয়া যাক। গল্পগুজব করে ধীরেসুস্থে আবার রওনা হব।
সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় নিশাত শুনল পুষ্প কাঁদছে। বেশ শব্দ করেই কাঁদছে। নিশাতের ব্যাপারটা ভালো লাগল না। কান্না হচ্ছে একটি খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এমনভাবে কাঁদা উচিত নয় যে অন্য কেউ তা টের পেয়ে ফেলে। কে যেন বলেছিল কথাটি— 'তুমি যখন হাস তখন দেখবে অনেকেই তোমার সঙ্গে হাসছে কিন্তু তুমি যখন কাঁদ তখন দেখবে কেউ তোমার সঙ্গে কাঁদছে না।' এটা কার কথা? রামকৃষ্ণ পরমহংস নাকি কবিরের দোঁহা?

১৩

সব বিখ্যাত লোকেরই কি চেহারা খারাপ থাকে? সরদার এ করিমকে দেখে নিশাতের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একজন নিতান্তই বেঁটে মানুষ কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে আছে। চোখ দুটি ব্যাঙের চোখের মতো অনেকখানি বের হয়ে এসেছে। চোখের মণি কটা। সবচেয়ে কুৎসিত দৃশ্য হচ্ছে নাকের ভেতরে বড় বড় লোম বের হয়ে আছে।
উকিলদের গলার স্বর ভরাট হবার কথা। কথা বললেই কোর্টরুমের সবাই যেন শুনতে পায়। এঁর গলা মোটেই সেরকম নয়। মেয়েদের মতো চিকন গলা। তবে উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট।
: আপনি ফরহাদ সাহেবের মেয়ে?
: জি।
: আপনার বাবা আমাকে টেলিফোন করেছিলেন।
: আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। আপনি আমার বাবার বয়সী।
: বাবার বয়সী সব লোকই কি আপনাকে তুমি করে বলে?
: জি না।
: তাহলে আমি বলব কেন? আচ্ছা শুনুন, কাজের কথায় আসি। আমি তো রেপ কেইস করি না। তবু কাগজপত্র উলটেপালটে দেখেছি নিতান্তই ভদ্রতার কারণে। শুধু সময় নষ্ট।
: রেপ কেইস কেন করেন না জানতে পারি?
: সত্যি জানতে চান?
: চাই।
: রেপ কেইসে জেতা যায় না। ভরাডুবি হয়। আর আপনার এই কেইসের কোন আশা দেখছি না। মেডিকেল রিপোর্টে কিছু নেই। কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই। আসামি হচ্ছে মেয়ের স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
: মেয়ের স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কি রেপ করে না?
: করবে না কেন, করে। তবে অধিকাংশ সময়েই ব্যাপারটা হয় আপোসে।



sohell.kazi@gmail.com

: আপনী কী বলতে চাচ্ছেন?
: কোর্টে গেলেই আপনি বুঝবেন আমি কী বলছি। এই মামলা তৃতীয় দিনের হিয়ারিং-এর পরই ডিসমিস হয়ে যাবে। একজন সার্জন যখন জানেন অপারেশন টেবিলেই রোগী মারা যাবে তখন তাঁরা অপারেশন করেন না।
: এমন সার্জনও আছেন যাঁরা রোগী মারা যাবে জেনেও অপারেশন করেন। সাধ্যমতো চেষ্টা করেন রোগীকে বাঁচাতে।
: আমি সেইরকম কেউ না। আমার মধ্যে বড় বড় আদর্শ নেই। তাছাড়া আমি 'রেপ' ব্যাপারটা খুব বড় করে দেখি না।
: তার মানে!
: এটা বেশ ক্ষুদ্র ব্যাপার মনে করি। একটা লোককে মারধর করে আপনি তার হাত ভেঙ্গে ফেললেন এতে আপনার শাস্তি হবে ছয়মাসের কারাবাস অথচ 'রেপে'র ক্ষেত্রে একটি মহিলা তার চেয়েও কম শারীরিক যাতনা বোধ করবে কিন্তু সেখানে শাস্তি হবে যাবজ্জীবন। এটা আনফেয়ার।
: শারীরিক যাতনাটাই দেখবেন, মানসিক যাতনা দেখবেন না?
: না। মন ধরাছোঁয়ার বাইরের একটা বস্তু। ঐ বস্তুকে আইনের ভেতরে আনা ঠিক নয়।
: আপনার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে।
: আচ্ছা, এক মিনিট। এক মিনিটের জন্যে আপনি বসুন।
নিশাত বসল। তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে খুব সাবধানে রুমালে সেই পানি মুছল যাতে দৃশ্যটি সামনে বসা এই নিম্নমানের মানুষটি না দেখে ফেলে। দেখে ফেললে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। এই রোগা, কুদর্শন নিম্ন মানসিকতার একটা মানুষ ক্রিমিন্যাল কেইসের প্রবাদতুল্যা পুরুষ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মন খারাপ হয়ে যায়।
: নিশাত আপনার নাম, তা-ই না?
: হ্যাঁ।
: আপনার বান্ধবী নিয়ে আসুন। আই উইল ফাইট ফর হার।
: মত বদলালেন কেন?
: আমি কেইস নেব না বলায় আপনার চোখে পানি এসে গেল তাই দেখেই মত বদলালাম।
: আপনি কেইস নেবেন না এটা শুনে আমার চোখে পানি আসেনি 'রেপ' সম্পর্কে আপনার ধারণা জেনে চোখে পানি এসেছে।
: এটা নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত মতামত। আমি তো এই মতামত প্রচার করছি না। যৌনতা ব্যাপারটাকে অন্য সবাই যেভাবে দেখেছে সেভাবে আমি দেখছি না। এটা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। আর দশটা শারীরিক ব্যাপারের চেয়ে আলাদা কিছু না। এর সঙ্গে আপনারা 'মন' যুক্ত করে একে মহিমান্বিত করছেন। আমার কাছে তা আনফেয়ার মনে হয়েছে। আজ এটাকে বিরাট অপরাধ মনে করা হচ্ছে। একদিন হয়তো হবে না। মূল্যবোধ বদলায়। এর সঙ্গে সঙ্গে বদলায় আইন। এক সময় শিশুকন্যা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলা হত। এটাকে কেউ অপরাধ মনে করত না। তারপর অপরাধ মনে করতে শুরু করলাম। এখান আবার করছি না।
: এখন করছি না মানে?



: ভ্রূণহত্যা করছি। ঢাকা শহরে অসংখ্য ক্লিনিক যারা এম আর-এর নামে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। যেহেতু পপুলেশন আমাদের বড় সমস্যা সেহেতু আমরা দেখেও না দেখার ভান করছি। কোন কোন দেশে ভ্রূণহত্যাকে আইনের স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে। সব দেশ নিজের সুবিধামতো আইন প্রণয়ন করে। আমেরিকার কথা ধরুন। আমরিকায় ফোর্জারি বা জালিয়াতির শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অথচ পৃথিবীর অন্য সব দেশে এটাকে চতুর্থ শ্রেণীর অপরাধ পর্যায়ে ফেলা হয়। শাস্তি বড়জোর পাঁচ বছর।
: আপনার বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগছে না।
: চা খান। চা দিতে বলি। চা খেয়ে আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আসুন। মহিলা কীরকম শক্ত দেখতে চাই। ক্রস একজামিনেশন সহ্য করতে পারবেন কি না কে জানে! কেউ পারে না।
: ও পারবে।
: না, উনিও পারবে না। পারার কথা নয়। যাক, সেটা কোন ব্যাপার না। ট্রায়াল সহ্য করতে না পারাটাই ভালো। জেরার মুখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তাহলে বেশ ভালো হয়।
: আপনার কথা বুঝলাম না।
: ব্যাপারটা সবাইকে এফেক্ট করে। সহানুভূতির অনেকটাই মেয়েটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আসলে কোর্টগুলো চালানো উচিত রোবটদের দিয়ে। যাদের কোনো ইমোশন নেই। পুরোপুরি ন্যায়বিচার মানুষের পক্ষে করা মুশকিল। আচ্ছা আপনি এখন উঠুন। আমি অন্য কাজ করব।

১৪

পুষ্প হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। এই ব্যাপারটা কি সত্যি সত্যি ঘটেছে না এটা তার অন্যান্য দুঃস্বপ্নের মতো দুঃস্বপ্ন? মিজান বসার ঘরে বসে আছে। চোখে সানগ্লাস। পরনে চকলেট রঙের একটা শার্ট। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে কাটা। মুখ হাসিহাসি।
: ভাবী চিনতে পারছেন? অধমের নাম মিজান। দরজা খোলা ছিল, বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছি। নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। রকিব বাসায় নেই? ওর সঙ্গে দরকার ছিল।
পুষ্প কী বলবে ভেবে পেল না। তার বুক ধকধক করছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবার ঐদিনকার মতো হবে নাকি? সে প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। সে খুব ঘামতে শুরু করেছে।
: আপনি কী চান?
: কিছুই চাই না ভাবী। নাথিং। পুলিশ যা যন্ত্রণা করেছে বলার না! কোর্টে হাজির করেই আবার পুলিশ রিমান্ডে। ঐ ইন্সপেক্টর বিরাট হারামজাদা। এখন অবিশ্যি ঠাণ্ডা।
পুষ্প মনে মনে লোকটির সাহসের তারিফ করল। কী সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে যেন কিছুই হয়নি। অনেকদিন পর বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। চা-টা খেয়ে বিদায় নেবে।
: রকিবকে খুঁজেছিলাম যন্ত্রণা মিটিয়ে ফেলবার জন্যেই। এই জিনিস কোর্টে গেলে তারই অসুবিধা। আমার কিছু না। আমি আজ যেমন ফ্রি ম্যান দশ দিন পরেও ফ্রি ম্যান।
মিজান সিগারেট ধরাল। সানগ্লাস খুলে রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করে আবার চোখে পরল। হাসিমুখে বলল, ঐদিন তেমন কিছু হয় নাই। ঠাট্টা-তামাশা করেছি। ভয় পেয়ে আপনি হয়ে গেলেন অজ্ঞান। জাস্ট বিছানায় শুইয়ে দিলাম। এর বেশি কিছু না। আপনি ভাবলেন কী না কী!
: আপনি এখন দয়া করে যান।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: যাব তো বটেই। এটা তো ভাবী আমার বাড়িঘর না। তবে এই কথাগুলো রকিবকে বলা দরকার যাতে তার মনে আবার আমার সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা না থাকে। বহুদিনের পুরানা দোস্ত।

: আপনাকে যেতে বলছি যান। আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব।

: বেশ তো করুন।

মিজান কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল যেন সত্যি সত্যি চিৎকারটার জন্যে অপেক্ষা করছে।

: ভাবী, ঠাণ্ডা মাথায় একটা কথা শুনুন। কোন বাপের ব্যাটার সাধ্য নেই এই কেইস প্রমাণ করে। কেন তাহলে শুধু শুধু ঝামেলা করছেন। লজ্জা অপমান যা—সবই তো আপনার।

: আমার অপমান নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত কেন?

: বক্কুর স্ত্রী, আমি ব্যস্ত হব না? কী বলেন আপনি! অবিশ্যি এটা আমার জন্যে বড় পাবলিসিটি। ব্যবসা করি তো! নানান লোকজনদের সঙ্গে মিশতে হয়। আপনি ভাবী রকিবকে বলবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে । আমি এখন মালিবাগের বাসায় আছি। ও ঠিকানা জানে।

মিজান উঠে পড়ল। পুষ্প ছুটে গেল পাশের ফ্ল্যাটে। নিশাত নেই। নিশাতের বোন দুলাভাই আজ চলে যাচ্ছেন। তাঁদের ফ্লাইট রাত দেড়টায়। আজ আর তার দেখা পাওয়া যাবে না। পুষ্প একবার ভাবল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণপুর চলে যায়। ভয়ে তার গা কাঁপছে। তার কেন জানি মনে হচ্ছে মিজান কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসবে। দরজা বন্ধ থাকলেও কোন না কোনভাবে ঢুকে পড়বে ভেতরে। হাসি হাসি গলায় বলবে, ভাবী চিনতে পারছেন? অধমের নাম মিজান।

পুষ্প অবিশ্যি নিশাতের বাসার ঠিকানা জানে। রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারে। যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আপা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে নতুন ঝামেলা। এমনিতেই আপা যা করছেন তার নিজের ভাই বা বোন তা করবে না। উকিল সাহেবের ফিসের টাকা পুরোটা উনি দিয়েছেন। অবিশ্যি তাকে প্রথম বলেছিলেন—উকিল সাহেব প্রথম দফায় ন'হাজার টাকা চেয়েছেন। দিতে পারবে পুষ্প?

পুষ্প বলেছে, আমার কাছে চার হাজার টাকা আছে। আমি ওকে বলব। ও জোগাড় করবে।

রকিব সব শুনে রাগী গলায় বলেছে, প্রথমবারেই নয় হাজার টাকা? এইটা কীরকম উকিল? একজন ব্যারিস্টারও তো পাঁচশো টাকার বেশি নেয় না। ঐ উকিল বাদ দিতে বলো। আমি দেখব।

: তুমি চেন কাউকে?

: চিনব না কেন? ভালোই চিনি।

পুষ্প নিশাতকে বলল, ও নিজে একজন উকিল দিতে চায় আপা। ওর চেনা কে নাকি আছে। টাকা নেবে না।

নিশাত বলেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। দু'তিনদিন পর জিজ্ঞেস করল, রকিব সাহেব কি কিছু করেছেন?

: না আপা।

: জিজ্ঞেস করেছিলে কিছু করেছি কি না?

: জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল করব। কেইসটার নাকি অনেক দেরি।



: খুব দেরি কিন্তু নেই পুষ্প।

: ও গা করছে না আপা। শুধু বলছে দেখি। ওর বোধহয় টাকাও নেই আমার গলার একটা হার দিই আপা, দু'ভরি সোনা আছে।

নিশাত বলেছে, আমি পরে তোমার কাছ থেকে হার নিয়ে যাব। এখন আমি চালিয়ে নিই। তুমি চলো তোমার সঙ্গে উকিল সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিই। ওনাকে দেখে প্রথমে ভক্তি হবে না। কিন্তু উনি খুবই নামকরা। উনি যা বলবেন মন দিয়ে শুনবে।

উকিল সাহেব প্রথমে সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন। প্রথম মিজান কবে এ বাসায় এ কখন এল। তার পরনে কী ছিল থেকে শুরু। তার পর কত রকম যে প্রশ্ন! যেমন— মিজান সাহেবের ড্রাইভার কি কখনো বাসায় এসেছিল? মিজান সাহেব কি কখনো চিঠিপত্র লিখেছিলেন?

বেশির ভাগ প্রশ্নেরই পুষ্প জবাব দিতে পারল না। এর মধ্যে একটি হচ্ছে—আপনার স্বামী কি কখনো মিজান সাহেবের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে নিয়েছেন। আপনি কিছু জানেন না?

: জি না।

: আপনার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবেন।

: জি আচ্ছা।

: আপনার স্বামীকে বলবেন তিনি যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করেন।

: জি আচ্ছা।

: তাঁকে কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবার ব্যাপার আছে। কারণ মিজান সাহেবের উকিল তাঁকে কোর্টে তুলবে। আপনি আগামী পরশু আপনার স্বামীকে আসতে বলবেন। বিকেল পাঁচটায় আমি ফ্রি থাকব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে লিখে রাখছি।

: জি আচ্ছা।

: আপনাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে। আপনি ফাঁদ থেকে বরে হয়ে আসবার জন্য উলটাপালটা কথা বলবেন না। যা জানেন তা-ই বলবেন। উকিল আপনাকে প্রশ্ন করলে জবাব নিয়ে আপনি ধাঁধায় পড়ে গেছেন, তখন তাকাবেন আমার দিকে। যদি দেখেন আমি ডানহাত মুঠি করে আছে তাহলে বলবেন, আমার মনে নেই। আর যদি দেখেন আমি দুটি হাতই মুঠি পাকিয়াছি তা হলে বলবেন, এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

: আমার এসব মনে থাকবে না।

: বাজে কথা বলবেন না। অবশ্যই মনে থাকবে।

পুষ্প রকিবকে টাকার কথাটা জিজ্ঞেস করল। রাতে ভাত খেতে বলল, তোমার বন্ধু কি তোমাকে কোন টাকা ধার দিয়েছিল?

রকিব চোখ কুঁচকে বলেছে, কেন?

: উকিল সাহেব জানতে চাচ্ছিলেন। দিয়েছিল?

: এর সাথে মামলার কী সম্পর্ক?

: জানি না কী সম্পর্ক। উকিল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন বলেই বললাম। তোমাকে যেতে বলেছেন।

: কী মুশকিল! আমি কেন যাব?

: যেতে বলেছেন। যাও।



sohell.kazi@gmail.com

রকিব গেল না। কেন গেল না কে জানে! নিশাত আপা বললেন, ঠিক আছে, যেতে না চাইলে কী আর করা! জোর করে তো আর নেয়া যাবে না। আমি তোমার লইয়ারকে বলব। তিনি কিছু বুদ্ধি নিশ্চয়ই করবেন। উনি বোধহয় চান না তোমার কেইস কোর্টে উঠুক, তা-ই না পুষ্প?

: আমি জানি না আপা। মাঝে মাঝে মনে হয় চায়। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় চায় না। কী যে মুশকিলে পড়েছি আপা!

: কোন মুশকিল নেই। আমি আছি তোমার পাশে।

নিশাত আপার কথায় পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। যার কথায় ভরসা পাওয়া যেত সে আছে চুপ করে। মিজান আজ এসেছিল এই খবর শুনলে সে কী করবে কে জানে! হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাবে। তাকে এই খবর কিছুতেই বলা যাবে না। বরং একতলার বাড়িওয়ালার বাসা থেকে নিশাত আপাকে টেলিফোন করে বলা যায়।

পুষ্প তা-ই করল।

## ১৫

সুরমা দুপুরে খাবারের বিশাল এক আয়োজন করেছেন। ঢাকার সব আত্মীয়স্বজনদের বলেছেন। মেয়েজামাই চলে যাবে এই উপলক্ষে সবাই মিলে একটা আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে আনন্দ-উৎসবের সুর বাজছে না, মীরু অনবরত কাঁদছে। দেশ থেকে যাবার দিন মীরু সব সময় এরকম করে কেঁদে কেঁদে ভাসায়। তার কান্নাকাটি দেখে নিমন্ত্রিত অতিথিরাও অস্বস্তি বোধ করেন। সুস্বাদু সব খাবারও মুখে রোচে না।

ইয়াকুব স্ত্রীকে কিছুক্ষণ সামলাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। সে এখন বসেছে জহিরের পাশে। বারান্দার এক কোণায়। সাউথ ডেকোটার পেট্রোয়াড ফরেস্টের গল্প এমন ভঙ্গিতে করেছে যে জহির মুগ্ধ। শুরুতে জহিরের মনে হয়েছিল মানুষটা অহংকারী। সেই ভুল তার দ্বিতীয় দিনেই ভেঙেছে। মানুষটা মোটেই অহংকারী নয়। দারুণ আমুদে এবং খুবই খরুচে স্বভাবের। দু'হাতে টাকা খচর করে। মুখ শুকনো করে বলে— সাত দিনের জন্যে দেশে বেড়াতে এসে দেখি পথের ফকির হলাম রে ভাই! বলেই মুহূর্তে আরও বড় সংখ্যার টাকা খরচ করে বসে।

খুব খরুচে স্বভাবের মানুষ আমেরিকায় দীর্ঘদিন থাকলে ধাতস্থ যা। খরুচে স্বভাব নিয়মের ভেতর চলে আসি। এই লোকটির তা হয়নি। তার খরুচে স্বভাবের একটা নমুনা কিছুক্ষণ আগে জহির দেখল এবং তার চমৎকার লাগল। ব্যাপারটা এইরকম—

ইয়াকুব দেশে খরচ করবার জন্যে যা ডলার জমিয়েছিল তার পুরোটা সে খরচ করতে পারেনি। দু'হাজার সাতশো টাকা বেঁচে গিয়েছে। এই টাকাটা সে ফেরত নিতে চায় না। টাকাটা খরচ করবার একটা কায়দাও সে বের করল— একটা লটারি হবে। এ বাড়ির মানুষদের মধ্যে লটারি। যার নাম উঠবে সে-ই পুরো টাকাটা পাবে। সবার খুব উৎসাহ। নাম লিখে একটা ঠোঙায় রাখা হল। ইয়াকুব বলল, এ বাড়ির কাজের লোকদেরও নাম দেয়া হয়েছে তো?

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, সেকী! ওদের নাম কেন!

ইয়াকুব হেসে বললেন, ওরাও তো এ-বাড়ির লোক মা। ওরা বাদ থাকবে কেন? ভাগ্যক্রমে ওরা যদি কেউ পায় তা কেমন মজা হয় দেখবেন। ওদের আনন্দটা দেখবার মতো।

হলও তা-ই। মালীর নাম উঠে গেল।



সে কিছুক্ষণ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। টাকা হাতে নিয়ে বোকার মতো সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ইয়াকুব বলল, যাও, এবার টাকা খরচ করো। লটারিতে জিতলে। তোমার নাম উঠেছে।

মালী তবুও নড়ে না। ভয়ে ভয়ে অন্যদের মুখের দিকে তাকায়। শেষটায় কেঁদেকেটে বিরাট নাটক।

এই নাটকটি জহিরের পছন্দ হয়েছে। সে মুগ্ধ। এখনও সে পেট্রোয়াড ফরেস্টের গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনছে। ইয়াকুব গল্প বলছে সমস্ত শরীর দিয়ে, হাত নাড়ছে, মাথা নাড়ছে, ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে।

: পুরো বনটাই অনেক অনেক বছর আগে কোন এক প্রাকৃতিক কারণে পাথর হয়ে গেছে। অবিশ্বস্য ও কল্পনীয় ব্যাপার। বনের কীটপতঙ্গ সবই পাথর। চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না।

: আপনি নিজে দেখেছেন দুলাভাই?

: অফকোর্স। পাঁচ ডলার করে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। তবে ঢুকবার পর মনে হয় টিকেটের দাম আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। লোকজন আমেরিকা যায়। দেখে ফালতু জিনিস। সিয়ার্স টাওয়ার ডিজনিল্যান্ড। মানুষের তৈরি জিনিস তো সব জায়গায় এক রকম। প্রকৃতি একেক জায়গায় একেক রকম কাজ করে। গ্রান্ড ক্যানিয়নের কথা তোমাকে বলি। এক মিনিট, সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আসি।

ইয়াকুব উঠে চলে গেল। ঠিক তখন নিশাত এসে বলল, তুমি কি আমাকে একটু থানায় নিয়ে যাবে?

জহির ঠাণ্ডা গলায় বলল, কেন?

: পুষ্প টেলিফোন করেছিল। মিজান সম্ভবত জামিনে ছাড়া পেয়েছে। কত বড় সাহস! দেখা করতে এসেছে পুষ্পের সঙ্গে।

: তার জন্যে তুমি থানায় গিয়ে কী করবে?

: জানব ব্যাপারটা কী। নন-বেইলেবল ওয়ারেন্টে যে গ্রেফতার হয় সে ছাড়া পায় কীভাবে সেটা জিজ্ঞাসা করব। থানায় টেলিফোন করেছিলাম, শুধু এনগেজেড পাচ্ছি।

জহির শান্ত গলায় বলল, আমি এখন তোমাকে নিয়ে কোথাও যাব না। তোমার যদি যেতেই হয় নিজে নিজে যাও। এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করছ, আমি কিছু বলিনি। এই মুহূর্তে এটা নিয়ে আর ছোটাছুটি না করলে খুশি হব। একদিন সোশ্যাল ওয়ার্ক না করলেও তোমার তেমন কোন ক্ষতি হবে না এবং তোমার বান্ধবীরও কোনো বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। যা হবার ইতিমধ্যে হয়েছে।

নিশাত বলল, প্লিজ, তুমি আমার সঙ্গে এ- সুরে কথা বলো না। আমার খুব খারাপ লাগছে।

: আমি খুব সহজভাবেই তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমি দয়া করে এখানে বসে অন্তত একদিনের জন্যে মাথাটা হালকা রাখো। তুমি প্রতিটি মানুষকে বিরক্ত করছ।

: তা-ই নাকি?

: হ্যাঁ তা-ই। তোমার মীরু আপা বলছিলেন ভালো কোন সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে তোমার মাথাটা দেখাতে। তোমার মাথায় নাকি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।

: বোধহয় হয়েছে।

: নিশাত বসো আমার পাশে। বি ইজি। এসো দুলাভাইয়ের গল্প শুনি।



www.banglabook.com

www.banglabook.com

ইয়াকুব সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছে। নিশাতকে দেখি হাসিমুখে বলল, বিখ্যাত সমাজসেবিকা এইখানে কেন?

: সমাজসেবা আজ দিনের জন্যে স্থগিত। আজ শুধু আপনাদের সেবা করব।

: চমৎকার, খাবার দেয়ার এখনও সম্ভবত ঘন্টা খানেক দেরি আছে। তুমি আমাদের জন্যে ঠাণ্ডা কিছু নিয়ে এসো এবং ক্যামেরাটা এনে আমাদের দুজনের প্রাণ খুলে গল্প করার ছবিটা ধরে রাখো।

: আমি গল্প শুনবার জন্য বসলাম দুলাভাই। আমি নড়াচড়া করতে পারব না।

ইয়াকুব গ্রান্ড ক্যানিয়নের গল্প শুরু করল। জহির লক্ষ্য করল নিশাত সেই গল্প শুনছে না। সে খুবই অন্যমনস্ক। সে অন্য কিছু ভাবছে।

১৬

স্পেশাল ব্রাঞ্চের এ আই জি আব্দুল লতিফ নুরুদ্দিনকে টেলিফোন করেছেন। নুরুদ্দিন প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে দু'বার করে স্যার বলছেন। তাঁর চেয়ারে বসে থাকার মধ্যেও একটা অ্যাটেনশন ভঙ্গি চলে এসেছে। কথা ভালো শোনা যাচ্ছে না। লাইন ভালো না। থানায় হৈচৈও হচ্ছে প্রচুর। লোকজন কোত্থেকে এক পাগল ধরে এনেছে সে বড় ঝামেলা করছে। নুরুদ্দিন চোখে ইশারা করছেন পাগল সরিয়ে নিতে। তাঁর চোখের ইশারা কেউ বুঝতে পারছে না।

এআইজি আব্দুল লতিফ সাহেব বললেন, কথা শুনতে পাচ্ছেন, লাইনটা ডিস্টার্ব করছে।

: জি স্যার, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি স্যার।

: জামিন হয়েছে আপনি জানেন তো?

: জি স্যার জানি।

: ইনোসেন্ট লোকদের হ্যারাসমেন্ট যাতে কম হয় সেটা দেখতে হবে তো! পুলিশের তা-ই দায়িত্ব।

: তা তো বটেই স্যার।

: সোসাইটির রেসপেক্টেবল মানুষদের হাজতে চোরগুন্ডাদের সঙ্গে ফেলে রাখার কোন যুক্তি আছে কি? এরা তো পালিয়ে যাবার লোক না। কোর্ট যখন চাইবে তখনই এরা কোর্টে হাজির হবে।

: তা তো ঠিকই স্যার।

: এটা খেয়াল রাখবেন।

: নিশ্চয়ই স্যার। তবে ...।

: আবার তবে কী?

: না স্যার, বলছিলাম কি, যদি ভিকটিমকে বিরক্ত করে বা ভয় দেখায় তাহলে...।

: সেরকম কিছু দেখিয়েছে?

: এখনও কোন খবর পাইনি স্যার।

: তাহলে মনগড়া কথা বলছেন কেন? অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাবেন না। অতিরিক্ত উৎসাহ ভালো না।

: তা তো স্যার ঠিকই।

নুরুদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর এখন তেমন কিছু করার নেই। মিজান ঘুরে বেড়াবে কেউ তাকে কিছু বলবে না। মামলা কোর্টে না



ওঠা পর্যন্ত তার আপাতত কোন সমস্যা নেই। নন-বেইলেবল সেকশনের আসামি সমাজের উঁচু একটা স্তরে আছে বলেই বুকে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা সহ্য করা বেশ কঠিন। সহ্য করতে হয়। এর নাম চাকরি।

: স্যার আপনার টেলিফোন।

: আবার কে?

সেকেন্ড অফিসার ইঙ্গিতপূর্ণ একটি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল।

: অফিসার ইনচার্জ বলছি।

: কে নুরুদ্দিন, চিনতে পারছ?

: জি স্যার। স্লামালিকুম স্যার।

: একটা রেপ কেসের ইনভেস্টিগেশন তোমার এখানে হচ্ছে না?

: জি স্যার।

: কতদূর?

: দু'একদিনের মধ্যে ইনভেস্টিগেশন শেষ হবে স্যার।

: গুড, ভেরি গুড! এইসব কেস দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

: তা তো স্যার ঠিকই।

: অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার। কঠিন শাস্তি।

: অবশ্যই স্যার।

: সেইসঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে নিরপরাধ যাতে শাস্তি না পায়।

: অবশ্যই স্যার।

: মিজানকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি। চমৎকার ছেলে! সে কীভাবে জড়িয়ে পড়ল বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ভিকটিম অব সারকামস্টেন্স। যা-ই হোক, তুমি তোমার তদন্ত করো। মিজানের ব্যাপারে কোন রেফারেন্স দরকার হলে আমাকে বলবে।

: নিশ্চয়ই বলব স্যার। অবশ্যই বলব।

: আচ্ছা রাখলাম।

: স্লামালিকুম স্যার।

নুরুদ্দিন দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলেন। পাগলটা এখনও যন্ত্রণা করছে। থানার সবাই মনে হচ্ছে তাতে মজা পাচ্ছে। সবাই হাসছে। সেকেন্ড অফিসার নুরুদ্দিনকে বলল, স্যার, পাগলটা আপনাকে ভেংচি কাটছে।

নুরুদ্দিন দেখলেন, পাগলটা সত্যি সত্যি জিব বের করে তাঁকে দেখাচ্ছে।

১৭

দুটি গোলাপ গাছ মরে গেছে। জহির অবাক হয়ে গাছ দুটিকে দেখেছে। যে-ক'দিন বেঁচে ছিল এরা প্রচুর ফুল ফুটিয়েছে। বিরাট বড় বড় ফুল। হাতের মুঠোয় ধরা যায় না এত বড়। নামও অদ্ভুত— তাজমহল। গোলাপের তাজমহল নাম কে রেখেছিল কে জানে! যে-ই রাখুক এ বাড়িতে তাজমহলের সমাধি হয়ে গেল। জহির রান্নাঘরে ঢুকল। নিশাত পানি গরম করেছে। তার চোখ লাল। মনে হচ্ছে কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। সে জহিরের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টভাবে হাসল। জহির বলল, দুটি তাজমহল মরে গেছে। তুমি সেটা জানো?

: জানি।

: মনে হচ্ছে খুব একটা দুঃখিত হওনি।



sohell.kazi@gmail.com

: হয়েছি, তবে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসিনি। চা খাবে?

: না। আমি বেশ শকড্ হয়েছি।

: হওয়াই উচিত। তাজমহলের মৃত্যুতে শাহজাহানরাই শকড্ হবে। তুমি হচ্ছ শাহজাহান।

: ঠাট্টা করছ খুবই ভালো কথা, তবে তোমার উচিত সংসারটার দিকে আরও একটু নজর রাখা।

: সংসার তো আমাদের দুজনের। তাই না? আমার একার তো নয়। আমিও কি তোমাকে খুব কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করতে পারি না, গাছ দুটি কেন মরল?

জহির অবাক হয়ে বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাচ্ছ?

: মোটেই না। তুমি আমার প্রিয়তম মানুষ, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব কেন?

: আমার মনে হয় কিছু একটা হয়েছে, সেটা কী?

: আমার ঘুম হচ্ছে না। সারারাত প্রায় জেগে কাটাই। আমাকে কিছু ঘুমের ওষুধ এনে দেবে?

: ঘুম হচ্ছে না কেন?

: সোমবার কেইস কোর্টে উঠেছে সেই দুশ্চিন্তাতেই বোধহয়।

: তোমার কিসের দুশ্চিন্তা?

: সেটাও তো বুঝতে পারছি না। গত দু'রাত আমি এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের পাতা ফেলতে পারিনি। কেইস শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বোধহয় ঘুমুতে পারব না।

জহির অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নিশাত বলল, তুমি কি আমার একটা অনুরোধ রাখবে? কোর্টে আমার পাশে বসে থাকবে?

: তোমার কোর্টে যাবার কি দরকার আছে? যা করবার সবই তো করেছ!

নিশাত ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, থাক, তোমাকে যেতে হবে না। অন্যায় একটা অনুরোধ করলাম, কিছু মনে করো না।

পুষ্পকে কাঠগড়ায় ডাকা হয়েছে। শপথ নেয়ানো হবে। মিজানের পক্ষের উকিল ক্রস একজামিনেশন শুরু করবে। আদালতে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ-জাতীয় কেইসের ক্রস একজামিনেশন সাধারণত খুব মজার হয়ে থাকে। পুষ্পের ভেতরে একটা দিশেহারা ভাব দেখা যাচ্ছে। সে বারবার নিশাতের দিকে তাকাচ্ছে। জহির বসে আছে নিশাতের পাশে। সে সাতদিনের ছুটি নিয়েছে। বিচার চলাকালীন সে তার স্ত্রীর সঙ্গেই থাকবে। নিশাতের শরীর অসম্ভব খারাপ করেছে। মনে হচ্ছে চোখ বন্ধ করে এক্ষুণি সে এলিয়ে পড়বে।

জহির ফিসফিস করে বলল, খুব খারাপ লাগছে?

নিশাত বলল, না। শুধু পানির পিপাসা হচ্ছে।

: চলো পানি খেয়ে আসা যাক।

: না, আমি যাব না।

মাথার উপরে একটা ফ্যান আছে। কিছুক্ষণ পরপর ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। কোর্টঘরে নতুন চুনকাম করা হয়েছে। চুনের গন্ধের সঙ্গে মানুষের ঘামের গন্ধ মিশে কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ তৈরি হয়েছে।



সরদার এ করিম চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁকে কেন জানি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। আসামিপক্ষের উকিল হচ্ছে মিশ্রবাবু। অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক। তিনি কীভাবে ডিফেন্স নেবেন তা আঁচ করা বেশ কঠিন। ক্রস একজামিনেশন তিনি বেশ সহজভাবেই শুরু করেন। কিন্তু সেই সহজ জিনিস অতিদ্রুত কঠিন হতে শুরু করে। সাক্ষী বুঝতেও পারে না তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে চোরাবালিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যতই সে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করবে ততই তাকে ডুবে যেতে হবে।

বলুন আমি শপথ করিতেছি যে, যাহা বলিব সত্য বলিব ...।

পুষ্প যন্ত্রের মতো শপথবাক্য উচ্চারণ করল।

তার পরই তার বক্তব্য তাকে বলতে বলা হল। পুষ্প বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল। তার মুখ রক্তশূন্য এবং বারবার সে নিশাতের দিকে তাকাচ্ছিল। এছাড়া চোখে পড়ার মতো কিছু তার আচরণে ছিল না। দু'বার তার কথার মাঝখানে কোর্টে বড়রকমের গুঞ্জন উঠল। জজ সাহেবকে হাতুড়ি পিটিয়ে বলতে হল....অর্ডার অর্ডার।

তার পাশের কাঠগড়াতেই মিজান দাঁড়িয়ে আছে। সে একবার মিজানের দিকেও তাকাল। মিজান তাকে কৌতূহলী চোখে দেখছে।

মিশ্রবাবু এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ হাসাহাসি। তিনি পুষ্পের দিকে তাকিয়েও অল্প হাসলেন।

: আপনার নাম?

: পুষ্প।

: এটা তো আপনার ডাকনাম, ভালো নাম বলুন। নাকি আপনি চান আমরা সবই আপানাকে ডাকনামে চিনি?

আদালতে ছোট একটা হাসির গুঞ্জন উঠল। পুষ্প বলল, আমার ভালো নাম রোকেয়া।

:আপনার স্বামীর নাম হচ্ছে রকিব আহমেদ, তাই না?

: জি।

: সাধারণত স্বামীর পদবি মেয়েরা ব্যবহার করে থাকেন, যেমন আপনার হতো রোকেয়া আহমেদ। আপনি তা করছেন না, বাবার নামটাই আপনার বহাল আছে, এর কারণ কী?

পুষ্প জবাব দিল না। মিশ্রবাবু জবাবের জন্যে তেমন অপেক্ষাও করলেন না। দ্রুত অন্য প্রশ্নে চলে গেলেন।

: আপনার স্বামীর নাম ব্যবহার করতে চান না তার কারণ সম্ভবত স্বামীর সঙ্গে আপনার সম্পর্কে ভালো নয়।

: সম্পর্ক ভালো।

: আপনার স্বামী কি কোর্টে উপস্থিত আছেন?

: জি না।

: স্ত্রীর এত বড় একটি কেইসের ট্রায়াল চলছে অথচ স্বামী উপস্থিত নেই এটা কি ভালো সম্পর্কের কোনো উদাহরণ?

কোর্টে বড়রকমের হাসির শব্দ উঠল। পুষ্প অসহায়ভাবে তাকাল নিশাতের দিকে। তার পরই সহজ গলায় বলল, আমাদের একটা খুব ছোট বাচ্চা আছে। আমার স্বামী তার দেখাশোনা করছেন। বাচ্চাটার আজ জ্বর। একশো দুই জ্বর।

: আপনি কি আসামিকে চেনেন?



www.banglabook.com

www.banglabook.com

: জি। আমার স্বামীর বন্ধু।
: কী রকম বন্ধু? খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কি?
: জি।
: আপনার স্বামী দু'বার আসামির কাছে থেকে অর্থ সাহায্য নিয়েছেন এটা কি আপনি জানেন?
: জি না।

করিম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি অবজেকশন দিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু না দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন অর্থ সাহায্য যে করা হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। করিম সাহেব তা বললেন না। কারণ মিশ্রবাবু অতি ধুরন্ধর লোক, বিনা প্রমাণে এই প্রসঙ্গ কোর্টে তুলবেন না।

: অর্থ সাহায্য ছাড়াও আপনারা বিভিন্ন সময়ে আসামির কাছ থেকে নানা সাহায্য নিয়েছেন। আসামি আপনাদের জন্যে বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন, তাই না?
: জি।
: আপনাদের ভ্রমণের জন্যে তিনি গাড়ি এবং ড্রাইভার দিতেন।
: একদিন দিয়েছিলেন।
: এখন বলুন আসামি মিজান মাঝে মাঝে দুপুরবেলায় আপনাদের বাসায় যেতেন একটু আগেই একথা বলেছেন আপনি। তাই না?
: জি।
: স্বামীর অনুপস্থিতিতে যে উনি আপনার বাসায় আসতেন আপনার স্বামী কি তা জানতেন?
: জি জানতেন।
: তিনি এটাকে বিশেষ কিছু মনে করেননি, তাই না?
: জি।
: তিনি ইচ্ছে করে আপনাদের এই মেলামেশার সুযোগ দিচ্ছিলেন।
: জি না।
: আপনার একটি ছোট ছেলে আছে পল্টু তার নাম, তাই না?
: জি।
: ঘটনার দিন পল্টু কোথায় ছিল?
: নিশাত আপনার বাসায়।
: আমি যদি বলি আপনি স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে যৌনমিলনের সুবিধার কারণে আপনার ছেলেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে আপনি কী বলবেন?

পুষ্প হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মিশ্রবাবু বিজয়ীর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তাঁর এই দীর্ঘ জেরার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মেয়েটিকে কাঁদিয়ে দেয়া। নিশাত বিড়বিড় করে বলল, লোকটা এসব কী বলছে? এত নোংরা কথা সে কী করে বলছে? জহির তার দিকে তাকিয়ে বলল, আরও হয়তো কত কি বলবে। মনে হচ্ছে এটা মাত্র শুরু। তবলবার ঠকঠাক।

পুষ্পর কান্না তখনও পুরোপুরি থামেনি। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। এর মধ্যেই আবেগশূন্য গলায় মিশ্রবাবু তাঁর ডিফেন্স পেশ করলেন—

"এই মামলায় দীর্ঘ ক্রস একজামিনেশন বা প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন প্রয়োজন দেখছি না। ডাক্তারের দেয়া মেডিকেল রিপোর্টই যথেষ্ট মনে করি। সেখানে বলা হয়েছে



কোন সিমেন পাওয়া যায়নি। ধর্ষণের সময় ভিকটিম সাধারণত প্রবল বাধা দেয়, সে কারণে তার শরীরে নানা নক্ষত থাকে— তাও নেই। মামলা ডিসমিসের জন্যে এই যথেষ্ট। তবুও ঘটনাটা কী আমি বলছি। বিশ্বাস না করলেও মামলার ক্ষতি হবে না। তবে ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্যতা আপনারা সবাই স্বীকার করবেন।

এই সমাজে কিছু কিছু লোক তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের ব্যবহার করে কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধার জন্যে। রকিব সেইরকম একজন মানুষ। সে ক্রমাগত তার ধনী বন্ধুর কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে এবং ইন রিটার্ন এগিয়ে দিচ্ছে সুন্দরী স্ত্রীকে। স্ত্রীও স্বামীর কথামতোই কাজ করছেন। মিলনের ক্ষেত্র তৈরি করবার জন্যে পুত্রকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ যে পুত্রের সামনে বৃন্দাবনলীলা না দেখানোর মতো সুবুদ্ধি তাঁর হয়েছে।"

কোর্ট সেদিনকার মতো এডজর্নড হয়ে গেল। নিশাত চোখে অন্ধকার দেখল। এ তো ভরাডুবি! সরদার এ করিম কোর্ট এডজর্নড হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কী হবে এ নিয়ে সে কারও সঙ্গে আলাপ করতে পারল না। পুষ্প ক্রমাগত কাঁদছে। তাকে সামলানোও এক মুশকিল। লোকজনের কৌতূহলেরও কোন সীমা নেই। এক ফটোগ্রাফার বিশেষ অ্যাংগেল থেকে পুষ্পের কান্নার ছবি তুলবার চেষ্টা করছে। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসাও মুশকিল।

নিশাতের নিজেরও কান্না পেয়ে গেল।

## ১৮

আজ আসামির ক্রস একজামিনেশন হবে।

আসামি কাঠগড়ায় উপস্থিত।

সরদার এ করিম এগিয়ে গেলেন।

: আপনার নাম মিজানুর রহমান?
: জি।
: পুষ্প নামের মেয়েটিকে আপনি চেনেন।
: জি চিনি।
: সে যে অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে করেছে সেই সম্পর্কে আপনি কী বলতে চান?
: অভিযোগ সত্যি নয়।
: আমার জেরা শেষ হয়েছে। আপনি নেমে যেতে পারেন। এখন আমি আমার বক্তব্য পেশ করব।

মিজান অবাক হয়ে তাকাল। জজসাহেব তাকালেন। কোর্টে মৃদু একটা গুঞ্জন হল। করিম সাহেব সবার বিস্ময় উপভোগ করলেন। নিশাতের দিকে তাকিয়ে হাসির মতো ভঙ্গি করলেন। ইচ্ছে করেই এই নাটকীয়তা তিনি করছেন। এতে সবার মনোযোগ খুবই তীব্রভাবে তিনি আকর্ষণ করতে পারলেন। এর প্রয়োজন ছিল।

: মাননীয় আদালত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমি এখানে একটি দুর্বল মামলা পরিচালনা করতে এসেছি। আমার মক্কেলের মেডিকেল রিপোর্টে কিছু পাওয়া যায়নি। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী আমরা জোগাড় করতে পারিনি।

আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি এ দেশের ধর্ষিতা মেয়েদের মেডিকেল রিপোর্টে কখনো কিছু পাওয়া যায় না। ধর্ষিতা মেয়েরা প্রথম যে কাজটি করেন তা হচ্ছে ধর্ষণের সমস্ত চিহ্ন শরীর থেকে মুছে ফেলেন। অনেকবার করে স্নান করেন। গায়ে সাবান



sohell.kazi@gmail.com

যেন। কারণ তাঁদের ধারণা নেই যে এটা করা যাবে না। এটা করলে আসামিকে আমরা আইনের জালে আটকাতে পারব না।

আসামিকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আরেকটি বড় বাধা হচ্ছে সামাজিক বাধা। এই লজ্জা এবং অপমানের বোঝা কোন মেয়ে সাহস করে নিতে চায় না। যখন কেউ সাহস করে, তখন কোর্ট তাকে মোটামুটিভাবে ব্যভিচারিণী হিসেবে প্রমাণ করে দেয়। আমার মক্কেলের ব্যাপারেও সেটা ঘটেছে। তবে আমার মক্কেল শেষ পর্যন্ত কোর্টে মামলা নিয়ে আসতে পেরেছে এটা তার জন্যে একটা বড় বিজয়। অনেকেই তা পারে না। তাদের মামলা তুলে নিতে হয়। যেমন মামলা তুলে নিতে হয়েছিল ২১ বাই বি জিগাতলার আশরাফী খানমকে।

আশরাফী খানম আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ৫ই এপ্রিল ১৯৭৬ তারিখে মোহাম্মদপুর থানায় ডায়েরি করিয়েছিলেন। সেই ডায়েরিতে উল্লেখ আছে যে জনৈক মিজানুর রহমান বলপূর্বক তাঁকে ধর্ষণ করে। যথারীতি পুলিশি তদন্ত হয়। তবে তদন্তের মাঝামাঝি ফরিয়াদিপক্ষ কেইস উঠিয়ে নেয়। হয়তোবা আমি বলতে পারি কেইস উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যদি সেদিন সে তা উঠিয়ে না নিত তাহলে আজ এই মেয়েটি ধর্ষিত হত না।

মাননীয় আদালতের কাছে আমি জানতে চাচ্ছি আমরা কি তৃতীয় একটি মেয়েকে ধর্ষিতা হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখব নাকি রাখব না।

আমার বক্তব্য এই পর্যন্তই। আশরাফী খানম মোহাম্মদপুর থানায় যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন তার কপি আমি আদালতে পেশ করেছি।

করিম সাহেব বসে পড়লেন। দীর্ঘ সময় আদালতে কোন সাড়াশব্দ হল না। এ সময় করিম সাহেব নিশাতের কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, আমার তো ধারণা আমরা কেইস জিতে গেছি। আপনার কি তা-ই মনে হচ্ছে না?

sohell.kazi@gmail.com

নিশাত খুব কাঁদছে। জহির অবাক হয়ে বলল, তুমি এত কাঁদছ কেন? মামলা তো জিতে গেলে। একটা লোককে সারাজীবনের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দিলে। আজ তো তোমার আনন্দ করার দিন। ব্যাপারটা কী বলো তো?

ব্যাপারটা নিশাত বলতে পারল না। কারণ তা বলার মতো নয়। একই ঘটনা তার জীবনেও ঘটেছিল। সে তখন মাত্র কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। বড় দুলাভাই এক দুপুরবেলা তার ঘরে ঢুকে পড়লেন। কী লজ্জা, কী অপমান! কাকে সে বলবে? মীরু আপাকে? মাকে, বাবাকে? কাউকে সে বলেনি। বলতে পারেনি। আজও পারবে না।

তবে আজ সে মুক্তি পেয়েছে। মনের একটা বিরাট দরজা এতদিন বন্ধ ছিল। আজ খুলে গেছে। এক ঝলক সূর্যের আলো ঢুকে গেছে। আজ সে কাঁদছে আলোর স্পর্শে।

---

* উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা কাল্পনিক।



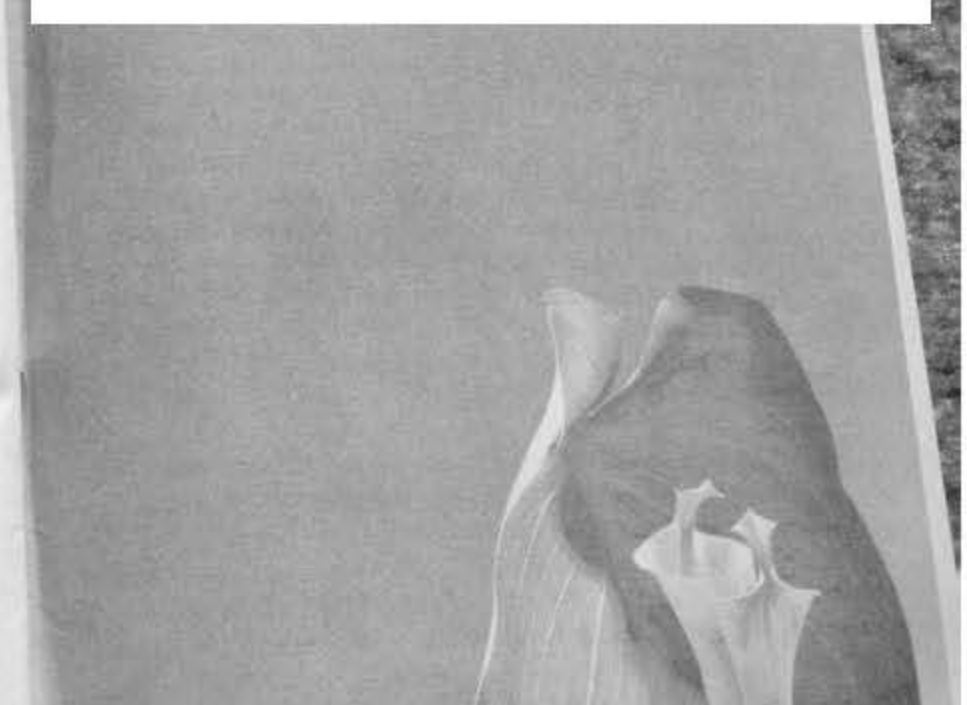

www.banglabook.com